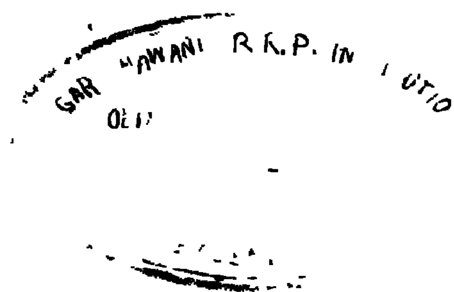
শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব্ব

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব্ব



শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীগিরীন্দ্র চন্দ্র সোম
২০৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—দুই টাকা
১৩৫১ মাঘ

প্রিণ্টার—শ্রীননীগোপাল সিংহ রায়
তারা প্রেস
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব্ব

বঙ্কিমচন্দ্র। রোহিণী, রোহিণী, আঃ বিরক্ত করে মারলে। কে বাপু। ও তুমি শরৎচন্দ্র? তুমি শরৎচন্দ্র, আমি বঙ্কিমচন্দ্র—আর রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের আকর্ষণ তো স্বাভাবিক। · কিন্তু ব্যাপার কি শরৎচন্দ্র?

শরৎচন্দ্র। আমি বলছি, তুমি রোহিণীর প্রতি অবিচার করেছ।

বঙ্কিমচন্দ্র। ওঃ এই কথা। আমি যে রোহিণীকে বিচার করতে বসেছিলাম, এ কথা তোমাকে কে বললে?

শরৎচন্দ্র। তুমি কি ·

বঙ্কিমচন্দ্র। হাঁ, আমি ডেপুটি ছিলাম বটে—

শরৎচন্দ্র। সে কথা বলছি না, তুমি কি ঔপন্যাসিক ছিলে না?

বঙ্কিমচন্দ্র। গল্প লিখতাম বটে—কিন্তু তাতে বিচারের কথা তো ওঠে না।

শরৎচন্দ্র। বল কি। ঔপন্যাসিকরা হচ্ছে সামাজিক মনের বিচারক।

বঙ্কিমচন্দ্র। কথাটা মনে রাখবো। আচ্ছা, রোহিণীর প্রতি আমি কি অবিচার করেছি—বলতো।

শরৎচন্দ্র। তুমি তাকে মেরে ফেললে কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র। আমি তো মারি নি, গোবিন্দলাল বলে একটা গোঁয়ার ছোকরা মেরেছিল।

শরৎচন্দ্র। ওই একই কথা হ'ল।

বঙ্কিমচন্দ্র। কি রকম?

শরৎচন্দ্র। গোবিন্দলালকে দিয়ে তুমিই মারিয়েছ।

বঙ্কিমচন্দ্র। বটে! কৃষ্ণকান্তের উইলের বাইরে যে-সব গোবিন্দলাল বিচরণ করছে, তারা কি রোহিণীদের মারছে না? সে সবও কি আমার কীর্ত্তি।

শরৎচন্দ্র। মারছে, কিন্তু অন্যায় ক'রে মারছে।

বঙ্কিমচন্দ্র। তাহলে আমার দোষটা কোথায়? আমি সংসারের ধারাকে মাত্র অনুসরণ করেছি। আর গোবিন্দলাল যদি রোহিণীকে না মারতো, তাহলে গোবিন্দলালের স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটানোতে তার প্রতি অবিচার করা কি হ'ত না?

শরৎচন্দ্র। নাঃ তোমার দরদের একান্ত অভাব।

বঙ্কিমচন্দ্র। দরদ! সেটা আবার কি?

শরৎচন্দ্র। দরদ জানো না?

বঙ্কিমচন্দ্র। না, আমাদের সময়ে ও কথাটা চলতি ছিল না। ওটার বাংলা কি?

শরৎচন্দ্র। দরদ, সিম্প্যাথি, করুণা। তোমাদের মধ্যবিত্ত সংস্কার যাদের অন্ত্যজ করে রেখেছিল তাদের আমি উপন্যাসের অন্তঃপুরে আদর করে এনে বসিয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্র। মধ্যবিত্ত সংস্কার! এ কথাটাও নূতন। আচ্ছা, সেই সৌভাগ্যবানেরা কে?

শরৎচন্দ্র। সৌভাগ্যবান্ নয়, সৌভাগ্যবতী, তবে ইচ্ছা করলে সৌভাগ্যবান্‌ও বলতে পারো, আমরা ব্যাকরণকে অত খাতির করিনে।

বঙ্কিমচন্দ্র। দু'চার জন সৌভাগ্যবতীর নাম শুনতে পারি?

শরৎচন্দ্র। সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মী।

বঙ্কিমচন্দ্র। এদের কি তুমি রোহিণীর দলের মনে কর?

শরৎচন্দ্র। কেন নয়?

বঙ্কিমচন্দ্র। এই জন্যে নয় যে তারা একদলের হলেও এক জাতের নয়, রোহিণী সাধারণ পতিতা, আর ও-তিন-জনের অসাধারণত্ব আছে।

শরৎচন্দ্র। তা আছে বটে।

বঙ্কিমচন্দ্র। তা হলেই দেখ, তোমার দরদ পতিতাদের প্রতি নয়, তাদের মধ্যে যারা বিশিষ্ট তাদের প্রতি।

শরৎচন্দ্র। কি রকম?

বঙ্কিমচন্দ্র। অর্থাৎ ওরা সমাজের যে-স্তরেই থাক সকলের উপরে ওদের মাথা দেখা যেতো। একটা দলের মধ্যে যারা কোন বিশেষ কারণে বিশিষ্ট তাদের প্রতি বিচার সে দলের প্রতি বিচার নয়, ওরা নিয়ম নয়, নিয়মের ব্যতিক্রম।

শরৎচন্দ্র। ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে ওরা পতিতাদের মধ্যে গিয়ে পড়েছে বলেই আমার মধ্যবিত্ত-সংস্কারযুক্ত মন ওদের পতিতাদের সামিল করে ফেলে নি।

বঙ্কিমচন্দ্র। তোমার মন সংস্কারমুক্তই হোক আর সংস্কৃতিগ্রস্তই হোক—ওদের এক করে ফেলতে পারতো না। বিধাতা পুরুষ ওদের বড় মাপে গড়েছিলেন—এই বড় মাপের পক্ষে খিড়কি দরজা ছোট হলেও সিংহদ্বার অবারিত, আর সিংহদ্বার যদি খাটো বলে ধরা পড়ে, তারা সে দরজা ভেঙে ফেলে দিয়ে প্রবেশ করে। সব দেশের সব সমাজেই এদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। Mary Magdalene-এর কাহিনী মনে আছে তো? তোমার দরদ আছে কি না, এবং কতখানি আছে, তার বিচার হবে তুমি সাধারণ মাপের পতিতাদের দিয়ে কি করিয়েছ। তোমার মোক্ষদাকে মনে পড়ে? মুখি ঝি, যে আগে নোটখানি আঁচলে

বেঁধে তবে কথা বলে। তাকে আঁকবার সময়ে তোমার দোয়াতের সব কালি উল্টে তার উপরে পড়ে গিয়েছিল—মনে হচ্ছে ?

শরৎচন্দ্র। আমি যা দেখেছি তাই এঁকেছি, বাড়িয়ে কমিয়ে ব'লিনি, আমি যে রিয়ালিষ্ট্।

বঙ্কিমচন্দ্র। বটে! বিচিত্র তোমার রিয়ালিজ্ম্। তোমার পতিতারা সতী সাধ্বী, আর ঘরের বউরা পতনশীলা।

শরৎচন্দ্র। কে বল্ল ?

বঙ্কিমচন্দ্র। রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী অত্যন্ত সাধ্বী, বহুনিষ্ঠাকে অতিক্রম করে তারা একনিষ্ঠায় এসে পৌঁছেছে। আর তোমার অচলা—চঞ্চলা, পতনশীলা, তোমার কিরণময়ী, অভয়া—সন্তঃপাতী। এমন অবাস্তব বাস্তবতা পেলে কোথায় ?

শরৎচন্দ্র। কিন্তু আমার দরদ তো শুধু পতিতাদের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এমন কি মেয়েদের মধ্যেও আবদ্ধ নয়, সমাজের যে কেউ যেখানে দুঃখ-কষ্ট-অনাচার-অত্যাচারের দ্বারা উৎপীড়িত, সকলের জন্য সমান ভাবে আমার করুণা।

বঙ্কিমচন্দ্র। কথাটা শোনাচ্ছে ভাল—একটু বিচার করা যাক। তুমি যাকে বলছ দরদ, যার অপর নাম হচ্ছে করুণা, সে বস্তু বৃষ্টিধারার মতো নিরপেক্ষ, দুর্য্যোধনের কুমড়োর ক্ষেত আর যুধিষ্ঠিরের বেগুনের ভুঁয়ে সমানভাবে তার আশীর্ব্বাদের বর্ষণ, তার কাছে কুরু-পাণ্ডবের ভেদ নেই।

শরৎচন্দ্র। বাঃ ঠিক বলেছ, বোধ করি এমন ভাবে বলতে আমিও পারতাম না।

বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু তোমার করুণা কি ভগবানের বৃষ্টিধারার মত নিরপেক্ষ ?

শরৎচন্দ্র। লোকের তো সেই রকম-ই ধারণা।

বঙ্কিমচন্দ্র। লোকের কথা ছেড়ে দাও—তোমার একখানা উপন্যাস

নিয়ে আলোচনা করা যাক , ধর তোমার 'পল্লী-সমাজ', বইখানা আমায় খুব ভাল লাগে, অনেকবার পড়েছি , প্রথম দিক্‌টা চমৎকার, কিন্তু শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সমাজের থিওরিকে কাজে খাটাতে গিয়ে সব মাটি করে ফেলেছ। সে যাক গে—প্রথম দিক্‌টাই যথেষ্ট। রমার উপরে তোমার দরদ আছে, কারণ রমার দুঃখের মূলে সামাজিক বিধান , রমেশকে বিবাহ করতে পারলে সে হয়তো সুখী হ'ত। রমেশের প্রতিও তোমার দরদের অন্ত নাই—শহরের মানুষ হয়ে সে গ্রামে এসে পড়াতে বড় বড় শুভ ইচ্ছার পালোয়ারি নৌকা গ্রাম্য সংস্কারের আওড়ে পড়ে বান্‌চাল হয়ে যাচ্ছে, তাকেও তোমার করুণা। আকবর লাঠিয়াল, যে একজনের হুকুমে আর এক জনের মাথা গিয়ে ফাটিয়ে আসে, তার মধ্যেও তুমি মানবমহত্ত্ব আবিষ্কার করেছ, আমরা দেখে বিশ্বাস করেছি। কিন্তু এ থেকে প্রমাণ হয় না যে, সকলের প্রতি তোমার করুণা!

শরৎচন্দ্র। বাদ পড়ল কে?

বঙ্কিমচন্দ্র। বেণী ঘোষাল।

শরৎচন্দ্র। সেটা তো বদ্‌মাইস। বিশেষ তো উৎপীড়িত নয়—সেই তো উৎপীড়ক।

বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু পেয়াদার উপরেও পেয়াদা আছে।

শরৎচন্দ্র। অর্থাৎ—

বঙ্কিমচন্দ্র। উৎপীড়কেরও উৎপীড়ক আছে।

শরৎচন্দ্র। কে সে?

বঙ্কিমচন্দ্র। কোন লোক নয়—একটা ব্যবস্থা, কখনো সামাজিক, কখনো রাষ্ট্রিক।

শরৎচন্দ্র। বুঝিয়ে বল।

বঙ্কিমচন্দ্র। বেণী ঘোষাল খারাপ লোক, কিন্তু খারাপ হ'ল কি করে! রমেশ যে পল্লী-সমাজ থেকে ঘটনাচক্রে দূরে গিয়ে পড়েছিল বেণীর ভাগ্যে

তা হয়ে ওঠে নি। রমেশ পল্লী-সমাজে থেকে গেলে খুব সম্ভবতঃ, আর একটা দুর্দ্দান্ততর বেণী ঘোষালের সৃষ্টি হ'ত। বর্ত্তমানে বেণী ঘোষাল যে পল্লী-সমাজের অংশবিশেষ, চিরকাল তা ছিল না। এখন দেখছ বেণী ঘোষাল একজন exploiter, কিন্তু আদ্যন্ত ইতিহাস স্মরণ করে দেখ—এক হিসাবে সেও exploited। এই কথা দুটো আজকাল খুব চলছে, না? তোমার দৃষ্টির যথেষ্ট উদারতা থাকলে দেখতে পেতে, অত্যাচারটার সৃষ্টি বেণী ঘোষাল থেকে নয়—তার পিছনেও বহুদূর অবধি অত্যাচারের শৃঙ্খল চলে গিয়েছে, বেণী সেই শৃঙ্খলের মধ্যে একটা গিঁঠমাত্র। যেমন ভিড়ের ব্যাপার আর কি? তুমি দুষছো আমি তোমাকে ধাক্কা দিলাম—কিন্তু আমি যে পিছন থেকে ঠেলা খাচ্ছি। বেণী ঘোষাল অত্যাচার করছে, কিন্তু কত ক্ষুদ্র অত্যাচার, কত নীরব সংস্কার, কত অকথিত ঘৃণার চাপে স্বাভাবিক মনুষ্য প্রকৃতি বিকৃত হলে তবে বেণী ঘোষালের সৃষ্টি সম্ভব তা কি তুমি জানো? আর যদি জানতে তবে তোমার করুণার বৃষ্টি রমেশের কৃষিক্ষেত্রে নিঃশেষে পতিত হয়ে বেণী ঘোষালের ভুঁইকে শুষ্ক করে রাখ্‌তো না।

শরৎচন্দ্র। একথা মেনে নিলে তো জগতে খারাপ লোক থাকে না।

বঙ্কিমচন্দ্র। মেনে নিলেও থাকবে, না নিলেও থাকবে। খারাপ লোককে ভাল করবার জন্যে তোমাকে মুক্তি-ফৌজ খুলতে বলিনি, আর জগতে যখন খারাপ লোক আছে, আর রিয়ালিষ্ট্ লেখক আছে, তারা যথাযথ ভাবে চিত্রিত হবেই। আসল কথা হচ্ছে, খারাপ লোক কি অবস্থাচক্রে পড়ে' কোন্ সুদূর-প্রসারী কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার ফলে খারাপ হ'ল—সেটা দেখিয়ে দিতে হবে।

শরৎচন্দ্র। তা হলে কি হবে?

বঙ্কিমচন্দ্র। তা হলে তার প্রতি সুবিচার করা হবে, আর সুবিচার করা মানেই তাকে করুণা করা। শেক্সপীয়র এই রহস্য অবগত ছিলেন—

ম্যাকবেথের অপরাধের দণ্ড দিতে তিনি দুর্ব্বলতা করেননি, ধনে-জনে-মানে-প্রাণে তাকে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন—কিন্তু যে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলায় ম্যাকবেথের প্রাথমিক মহত্ত্ব লঘুতর হ'তে হ'তে, কলঙ্কিততর হ'তে হ'তে নৈতিক ও চারিত্রিক অন্তিমে এসে পৌঁছল, সেই সূত্রটা তিনি পাঠকদের দেখিয়ে দিয়েছেন, যার ফলে নরঘাতক, শিশুঘাতক, রাজঘাতক, বিশ্বাসঘাতক রাক্ষসটার প্রতিও আমরা করুণা অনুভব করি—তার মৃত্যুতে খুশী হই, তবু করুণার অভাব হয় না।

শরৎচন্দ্র। তুমি করুণার যে সংজ্ঞা দিচ্ছ, সে বস্তু তোমার গল্পেও নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র। কে বলেছে আছে? কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলালকে অপরাধী জেনেও কি তার প্রতি করুণা অনুভূত হয় না? নগেন্দ্রনাথের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা জেনেও তার প্রতি মমত্ব-বোধ হয় না? শেষ পর্য্যন্ত হীরা দাসীর পতনে কি তাকে অধিকতর করুণার যোগ্য বলে মনে হয় না? আর সেই যে সাম্রাট্‌কন্যা জেব-উন্নিসা পুষ্পশয্যায় বসে যে দাবানলের দাহে পলে-পলে দগ্ধ হয়ে মরেছে, তার প্রতি পাঠকের অযাচিত করুণা কি স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে ওঠে না?

শরৎচন্দ্র। তোমার করুণা এত নিরপেক্ষ যে তার মত কঠিন অল্প বস্তুই আছে। এই করুণার স্পর্শে মানুষ অমানুষ হয়ে পড়ে। চন্দ্রশেখরের প্রতাপকে ধরা যাক। সে কি শৈবলিনীকে ভালবাসতো? আমার বিশ্বাস বাসতো—কিন্তু সে যত সহজে তাকে পরিত্যাগ করলে, তাতে মনে হয় না, প্রতাপের পাঁজরার তলে স্বাভাবিক মানবহৃদয় ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র। না মনে হবার কারণ কি?

শরৎচন্দ্র। তা হলে এক আধবার এক আধটা অস্ফুট বাক্যেও তার মর্ম্মগ্রন্থিছেদের আর্ত্তনাদ শোনা যেতো।

বঙ্কিমচন্দ্র। বইখানি অনেক দিন আগে পড়েছিলে মনে হচ্ছে।

নতুবা শেষ দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত প্রতাপের আক্ষেপ ভুলতে পারতে না। শৈবলিনীকে ভাল না বাসলে সে কি ওসব কথা অমন করে বলতো।

শরৎচন্দ্র। এই কটি কথাই কি যথেষ্ট ?

বঙ্কিমচন্দ্র। যথেষ্ট নয়, তা জানি। তোমার নায়করা এত অল্পে সন্তুষ্ট হয় না—কি করে কেঁদে আত্মপ্রকাশ করতে হয় তারা জানে। তোমার ধারণা প্রেমের নিবাস চক্ষুতে, কখনো তার প্রকাশ কটাক্ষে, কখনো অশ্রুতে। তোমার নরেন, একটা বিলাত-ফেরত জগদ্দল ডাক্তার, তুমি যাকে বলো 'জিনিয়স্'—সে লোকটা অনাত্মীয় যুবতীর কাছে যে ভাবে তার দুরবস্থা প্রকাশ করেছে, স্বীকার করছি, তা লিখবার 'মরাল কারেজ' আমার ছিল না।

তোমার নায়করা আসলে কাপুরুষ, কাপুরুষের সব লক্ষণ তাদের মধ্যে আছে, তারা কাপুরুষ বলেই বাস্তবকে স্বীকার করে নেবার সাহস তাদের নেই, তারা শেষ মুহূর্ত্তে বিবাহ করতে পাবে না, আবার কাপুরুষ বলেই পরিত্যক্ত নায়িকাকে—হয়তো এখন সে পরস্ত্রী কিম্বা বিধবা—অন্ধকারে সুযোগমত পেলে দুটো প্রেমের কথা বলে নেবার লোভ ছাড়তে পারে না! তুমি একে বল মানব-হৃদয়ের প্রকাশ !

শরৎচন্দ্র। যা স্বভাব, তাকে অস্বীকার করে লাভ কি ?

বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু স্বভাবটা এমন অস্বাভাবিক হ'ল কেন, তারও তো সন্ধান নেওয়া দরকার। বাঙালী এই ক'বছরের মধ্যেই এমনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে, মনের দুর্ব্বলতাকে চেপে রাখবার মত সবলতাও তার নাই।

শরৎচন্দ্র। কিন্তু তোমার আমলে হৃদয়াবেগ অল্প ছিল বলে তা প্রকাশ পেতো না—এমনও তো হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র। বিপরীতটাই বা সত্য নয় কেন? আমার সময়ে

হৃদয়াবেগও যেমন প্রবল ছিল তাকে আয়ত্ত করে রাখ্‌তে পারে এমন ষ্টীম বয়লারেরও অভাব ছিল না। এখন হৃদয়াবেগ যে প্রবলতর তা নয়, ষ্টীম বয়লার দুর্ব্বলতর হয়ে পড়েছে।

শরৎচন্দ্র। এই ক'বছরে এমন কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে যাতে বয়লার দুর্ব্বলতর হয়ে পড়্‌ল?

বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিমধ্যে বাংলা দেশের মস্ত একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

শরৎচন্দ্র। কি রকম?

বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙালীর চরিত্র থেকে ধৃতি বলে একটা পদার্থ চলে গিয়েছে। ধৃতি না বলে ধর্ম্ম কথাটাই মুখে আসছিল, কিন্তু তা'তে বুঝতে ভুল হ'ত।

শরৎচন্দ্র। তোমার ধৃতিই যে বুঝেছি এমন কথা ভাবলে কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র। ধর্ম্ম আর ধৃতি একই বস্তু—তবে ধর্ম্মকে আমরা religion এর বাংলা বলে ব্যবহার করে থাকি তাই ওতে অন্য অর্থের আভাস এসে পড়েছে। ধৃতি হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের মেরুদণ্ড—যা থাক্‌লে একটা মানুষ সংসারের ভিড়েরা চাপে নিজের পথে চলতে পারে—আর যার অভাব হলে বাঙালীর মত চলে।

শরৎচন্দ্র। বাঙালীর চালটা কি শুনি?

বঙ্কিমচন্দ্র। দায়িত্ববিমুখ, ঘর-পালানো লোকের চাল! দেখ্‌ছ না বাঙালী আজ অত্যন্ত অকারণেই রিয়ালিষ্ট হয়ে উঠেছে—তার কারণ কি জানো? সে আজ বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াতে ভয় পায়। বাস্তবের সম্মুখে দাঁড়াবে—এটা তার ইচ্ছা—কিন্তু সে শক্তি তার নেই—কাজেই ইচ্ছাটাকে সে তথ্য বলে ধরে' নিয়ে একটা অবাস্তব বাস্তবতার সৃষ্টি করেছে। তুমি সেই অবাস্তব-বাস্তবতার মুখপাত্র।

শরৎচন্দ্র। বাঙালীকে এত বড় অপবাদ দিলে, কিন্তু কোন প্রমাণ তো দিলে না।

বঙ্কিমচন্দ্র। প্রমাণ প্রতিদিন সংবাদপত্রে বের হচ্ছে। বাংলাদেশের যে কোন দৈনিক খুললে এক সার বিজ্ঞাপন দেখবে—যাতে ঘর-পালানো ছেলেকে ফিরে আসবার জন্য তাদের স্নেহাসক্ত আত্মীয়-স্বজনেরা অনুরোধ করছে। এমন ঘর-পালানো দশা আমাদের সময়ে বাঙালীর ছিল না। যে তথ্যবিমুখতা ব্যাধির কথা আমি বললাম—এটা তারই একটা মারাত্মক লক্ষণ। এটা আর কিছুই নয়—ধৃতিহীনতার চিহ্ন, আধুনিক বাঙালী লক্ষ্যহীন ভাবে খড়-কুটোর মত সংসারের স্রোতে ভেসে চলেছে, মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা থাকলে এমন হয় না।

শরৎচন্দ্র। কিন্তু তার সঙ্গে আমার যোগ কোথায়?

বঙ্কিমচন্দ্র। তুমি এই লক্ষ্যহীন, ঘর-পালানো, তথ্যবিমুখ বাঙালী চরিত্রকে অঙ্কন করেছ, বাঙ্গালী পাঠক তোমার উপন্যাসের দর্পণে তার প্রতিবিম্ব দেখবামাত্র নিজেকে চিনতে পেরেছে—আর তোমাকে তার আত্মীয় বলে গ্রহণ করেছে, আত্মীয় না হলে কেউ কি আত্মীয়কে এমন ভাবে প্রকাশ করতে পারে? তোমার জনপ্রিয়তার মূল ওইখানে।

শরৎচন্দ্র। আমি নিজে ঘর-পালানো ছিলাম বটে—তুমি কি সেই কথা বলছ?

বঙ্কিমচন্দ্র। তোমার ব্যক্তিগত কথা তুমিই জানো। কিন্তু তোমার সৃষ্ট মানুষগুলো দেখ না। সব লক্ষ্যহীন, ভেসে-যাওয়া খড়কুটো। কোন কিছুকে তারা আঁকড়ে ধরতে পারছে না। তোমার দেবদাস, সতীশ, শ্রীকান্ত, জীবানন্দ, এরা সব ঘর-পালানোর দল। এদের প্রত্যেকের জন্য সংবাদপত্রে ফিরে আসবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতো। তোমার শ্রীকান্ত চারটা পর্ব্বের মধ্যে দিয়ে কোথায় যে ভেসে চলেছে তার ঠিক নেই। এরা হচ্ছে আধুনিক বাঙালী—আর আধুনিক বাঙালী হচ্ছে এরাই! আধুনিক অভাজন বাঙালীর এমন চিত্র আর কেউ আঁকতে পারেনি—সে আমি স্বীকার করবো।

শরৎচন্দ্র। বাঙালীর এমন লক্ষ্মীছাড়া দশা কেন হ'ল বলতে পার?

বঙ্কিমচন্দ্র। পারি বই কি। আশাভঙ্গ হলে এমন হয়—ভবিষ্যতে বিশ্বাস না করলে এমন হয়।

শরৎচন্দ্র। আশাভঙ্গটা কোথায়?

বঙ্কিমচন্দ্র। ইংরিজি শিক্ষার প্রথম আমল থেকে বাঙালী একটা হাওয়ার কেল্লা গড়ে তুলছিল, ভেবেছিল এই কেল্লার গম্বুজ একদিন শেষে তার কামনার স্বর্গে গিয়ে ঠেকবে—কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমেই দেখ্‌তে পেল, হায় হায়। তার কেল্লা নিজের ভারেই নিজে ধ্বসে পড়্‌ল— সমস্ত দেশটাকে তার ভগ্নস্তূপের তলে চাপা দিয়ে। আর সেই আশা-ভঙ্গের নীচ থেকে চাপা-পড়া জাতির আর্ত্তনাদ উঠছে।

উনবিংশ শতকের বাঙালী দেখেছিল—ছ' পাতা ইংরিজি পড়লেই চাকুরী পাওয়া যায়, দেখেছিল, ছ'কলম ইংরিজি লিখতে পারলেই বর্ক, মেকলে হওয়া যায়, খানিকটা ইংরিজি বক্তৃতা করতে পারলেই লোকে ডিমস্থিনিস্ বলে! তারা দেখেছিল, সদাগরী অফিসে ঢুকলে অঢেল টাকা। ভবিষ্যতের উপরে তাদের অগাধ বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—ভেবেছিল, এই পথই গিয়েছে চরিতার্থতার দিকে।

শরৎচন্দ্র। তুমি কি বলতে চাও—ইংরিজি শিক্ষা ভ্রান্ত?

বঙ্কিমচন্দ্র। আমি বলতে চাই, বাঙালী ভ্রান্ত। পথ যত দীর্ঘই হোক তারও শেষ আছে। বাঙালী ভেবেছিল, ইংরিজি শিক্ষার কোন শেষ নেই। কিন্তু সে পথে চলতে চলতে সে দেখল—সম্মুখে পথ রুদ্ধ, যাকে এত দিন সে রাজপথ বলে মনে করেছিল—হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ল, তা কাণা গলি মাত্র।

শরৎচন্দ্র। অতএব—

বঙ্কিমচন্দ্র। অতএব হয় নিষ্করুণ দেয়ালে মাথা ঠুকে মর—নয় ফিরে এস। আমি আমার সামান্য শক্তি অনুযায়ী সেই ফিরে আসবার কথা

বলেছিলাম—হয়তো কেউ কেউ শুনেছিল। সংক্ষেপে এই হচ্ছে বাঙালীর আশাভঙ্গের ইতিহাস। তার পর থেকে এ পর্য্যন্ত চলছে তার নৈরাশ্যের যুগ—যে-নৈরাশ্যে তথ্যভীত বাঙালী ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। তুমি লিখেছ সেই বাঙালীর কথা!

শরৎচন্দ্র। ওই ঘর-ছাড়ার দল কি নূতন পথের অনুসন্ধানে বের হয়নি!

বঙ্কিমচন্দ্র। হয়তো কেউ কেউ হয়েছে, কিন্তু তুমি তাদের সন্ধান পাওনি। তারা আজও সংখ্যায় মুষ্টিমেয়,—লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে অলক্ষ্যে তারা কাজ করে চলেছে। তুমি যাদের কথা জানো—তারাও ছুটেছে—নূতন পথের সন্ধানে নয়, পুরাতন পথ পরিত্যাগ করে। তাদের এ গতি প্রগতি নয়—পলায়ন, তারা টোলখাওয়া বাঙালীর দল, বাংলার ওয়াটার্লু থেকে পলায়নপর, ভালমন্দজ্ঞানহীন, হতাশ হতভাগ্যের দল। তোমার উপন্যাস বাঙালীর সেই পরাজয়ের ইতিহাস।

উতঙ্ক

কোন এক কলেজে আমার এক বন্ধু অধ্যাপক। মাঝে মাঝে তাহার কাছে যাই—অধ্যাপকদের অনেকের সঙ্গেই আলাপ হইয়াছে, মুখচেনা পরিচয় সকলের সঙ্গেই আছে।

সেদিন কলেজে গিয়া দেখিলাম বন্ধুটি ক্লাসে গিয়াছেন, কাজেই অধ্যাপকদের ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

দর্শন Cum-ধর্ম্মনীতির অধ্যাপক নাকে প্রচুর পরিমাণে নস্য ঠাসিয়া দিয়া বলিলেন—নাঃ আজকালকার ছাত্রদের না আছে পড়া শুনায় মন, না আছে তেমন গুরুভক্তি।

এই বলিয়া পাশের অধ্যাপকের দিকে মুখ ফিরাইতেই দক্ষিণা বাতাসে যেমন ফুলের পরাগ ঝরিয়া পড়ে, তেমনি তীব্র নস্যের গুঁড়া ভদ্রলোকটির নাকে গিয়া ঢুকিল।

তিনি সশব্দে হাঁচিয়া উঠিলেন—হ্যাচ্চ।

কিন্তু এই তুচ্ছ বাধাতে বিব্রত হইবার লোক পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপক নন, তিনি পূর্ব্বকথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন
—কিহে মনে আছে তো আরুণি, উতঙ্ক, ওদের কথা?

ভদ্রলোক আর একটি হাঁচি দিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়াছিলেন কিন্তু সহসা, বোধ করি উতঙ্ক ও আরুণির কথা মনে পড়িয়া গিয়া অসমাপ্ত হাঁচিটা রুমালে চাপিয়া দিলেন।

বুঝিলাম ইঁহারা সকলেই ধৌম্য, পরাশর, জাবালির ন্যায় আদর্শ গুরু কেবল উপযুক্ত শিষ্যের অভাবেই প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হইতেছে না।

২

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে সেই অধ্যাপকবাবুর সঙ্গে বৈঠকখানা বাজারের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম একজন যুবক বন্ধুকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। দুই হাত কপালে ঠেকাইবার সময়ে তাহার বাজারের দোদুল্যমান ঝুলির মধ্যে সোয়াসের বেগুন ও কিঞ্চিৎ পলাণ্ডু দুলিতেছিল।

বন্ধু শুধাইলেন—খবর কি ?

ছাত্রটি বলিল—স্তর, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বের সাব্‌সটান্সটা একটু যদি

বুঝিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-তত্ত্ব রচনা সার্থক হইয়াছে—নতুবা বাজার করিয়া ফিরিতে এমন জিজ্ঞাসার উদ্ভব সম্ভব হইত না।

বন্ধু বলিলেন—আর এক সময়ে হবে।

ছাত্রটি নমস্কার করিবার সময়ে নাকের কাছে সোয়াসের বেগুনের থলিটি পুনরায় দোলাইয়া বলিল—আজ্ঞে, তাই হবে।

কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি ?

বন্ধু একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল—আর বল কেন ? ছেলেটা আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যখন তখন যেখানে সেখানে পাঠ্যবিষয়ের প্রসঙ্গ তুলে বসে। সেদিন দেখি ফুটবল খেলার মাঠে কখন্ পাশে এসে বসেছে। বলে কিনা স্পোর্টস্ সম্বন্ধে Essay আসতে পারে—তাই খেলা দেখতে এসেছে। সারাক্ষণ ধরে কেবলি জিজ্ঞাসা করে—স্তর কয়েকটা Point বলে দিন। খেলা দেখা একদম মাটি করে দিল।

আমি বলিলাম—সে জন্য দুঃখ কর কেন? তোমরাই তো সেদিন দুঃখ করছিলে যে আজকাল আর উতঙ্কের মত ছাত্র পাওয়া যায় না।

বন্ধু বলিল—যা বলেছ। আমরা ঠাট্টা করে' নিজেদের মধ্যে ওকে উতঙ্ক বলেই উল্লেখ করি।

তারপর বন্ধুর কাছে উতঙ্কের জ্ঞানস্পৃহার অনেক ঘটনা শুনিয়াছি। সে যুগের উতঙ্ক ইহার কাছে অনেক কিছু শিখিতে পারিত।

উতঙ্ক প্রফেসারদের ক্লমে কোন প্রফেসরকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ দেয় না।

মনে করুন আ—বাবু পর পর তিন পর্ব্ব ক্লাস করিয়া আসিয়া পাখা খুলিয়া দিয়া বসিয়াছেন অমনি স্মিতবদন উতঙ্ক আসিয়া বলিল—স্যর ওয়ার্ডস্বার্থের সেই কবিতাটা?

আ-বাবুর তখনি মনে পড়িয়া গেল জীবনবীমার কিস্তি দিবার আজ শেষ তারিখ, তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

ইহাতে উতঙ্কের দুঃখ নাই জ্ঞানের বিষয় যেমন অনন্ত, প্রফেসারও তেমনি অনেক।

সে র-বাবুর কাছে গিয়া বলিল—স্যর, গীতার এই শ্লোকটা একবার দেখুন।

র-বাবুর বাড়ীতে গোরু আছে। তিনি গোরুর জন্য স্বহস্তে আড়াই হাজার খড় কুটিয়া কলেজে আসিয়াছেন, তখনও গো-প্রীতির ধাক্কা সামলাইতে পারেন নাই। তিনি জামার সাড়ে তিন পকেট (পাঞ্জাবীর ৩টা, ফতুয়ার ১টা ছোট) খুঁজিয়া চশমা পাইলেন না, কাজেই গীতার শ্লোকটি আর—

উতঙ্ক অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আচ্ছা থাক, আর এক সময়ে হ'বে।

সে গুটি গুটি ইতিহাসের অধ্যাপক বি-বাবুর দিকে রওনা হইল!

বি-বাবু উতঙ্ককে দেখিয়াই জগতের যত গাম্ভীর্য্য মুখমণ্ডলে লিপ্ত করিয়া বসিলেন।

উতঙ্ক তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—স্যর, বাড়ীতে সব খবর ভাল তো?

বি-বাবু বাড়ীর অদ্ভুত উদ্বেগে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—বড় খারাপ এখনই যেতে হ'বে।

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। সেদিন আর তাঁহার ক্লাশ লওয়া হইল না। বি-বাবু ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন—বাড়ীতে গিয়াই একখানা ক্যাণ্ডয়াল লীভের দরখাস্ত পাঠাইয়া দিতে হইবে।

এদিকে উতঙ্ক ক্রমে গণিত, অর্থনীতি, প্রভৃতির অধ্যাপকদের বিব্রত করিয়া দর্শন-Cum-ধর্ম্মনীতির অধ্যাপকের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল।

উতঙ্ক বলিল—স্যর—শঙ্কর—

তাহার কথা আর শেষ হইতে পারিল না। দার্শনিক অধ্যাপক ফুকারিয়া উঠিলেন—আছে, আছে সব আছে।

এই বলিয়া পকেট হইতে পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী এক দর্শনের প্রবন্ধ বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন—আর উতঙ্ক ঠায় দাঁড়াইয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল।

যেমন গুরুর উৎসাহ, তেমনি শিষ্যের ধৈর্য্য। আড়াই ঘণ্টা পরে প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইতে গুরু শুধাইলেন—কেমন?

উতঙ্ক বলিল—ভালই। তবে আপনি যে শঙ্করের কথা বল্লেন—

অধ্যাপক রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—ইউরোপের পণ্ডিতদের কথা ছেড়ে দাও। এক শঙ্কর ছাড়া দ্বিতীয় শঙ্কর নেই—অষ্টম শতাব্দীর গোড়াতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

উতঙ্ক বলিল—সে কি স্যর—শঙ্কর যে এখনো বেঁচে আছে—আমাদের খেলার সেক্রেটারি শঙ্কর ঘোষ।

অধ্যাপক চীৎকার করিয়া উঠিলেন—(স্বকীয় ভাষা এবং রোমশ বক্ষঃস্থল বাহির হইয়া পড়িল)—খেল্‌বা, খেল্‌বা, কিছু তো বোঝবা না। বোঝবা কেম্‌নে! অহোহ ইণ্ডিয়ান কালচারটার বেবাক্‌ নাশ করে ফেল্‌লা। ওহে দাও তো একটিপ নস্য।

একবার এ পাশে তাকাইলেন কেহ নাই, ওপাশে তাকাইলেন কেহ নাই, সম্মুখে কেহ নাই, ঘরের মধ্যে কেহ কোথাও নাই। গুরু-শিষ্য সংবাদের মাঝখানে অন্যান্য অধ্যাপকেরা প্রাণ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন—কেবল পিছনে অনুতপ্ত উতঙ্ক নম্রশিরে দাঁড়াইয়া আছে।

৩

উতঙ্ক আন্তঃকলেজ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কলিকাতায় এমন কলেজ নাই যেখানে তার গতিবিধি না আছে। এমন অধ্যাপক নাই যার কাছে একাধিকবার সে না গিয়াছে, পাছে ভুল হয় তাই একখানি নোট বুকে খ্যাতনামা অধ্যাপকদের বাড়ীর ঠিকানা টুকিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। অবশেষে আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট উতঙ্ক খাস বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত আরম্ভ করিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা তো আর ছাত্রবেতন পরিচালিত আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজের স্বল্প বেতনের অধ্যাপক নন—তাঁহাদের যেমন মেদ তেমনি মেধা, যেমন বিদ্যা তেমনি বেতন, যেমন দায়িত্ব তেমনি দেনা, যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা তেমনি বাড়ীর উচ্চতা—সংক্ষেপে তাঁহারা জাতিগঠনে নিরত—আর কলেজের অধ্যাপকরা তো কেবল ছাত্র-পাশ করায়। ধিক্‌! অবশ্য সেই ছাত্রদের পরীক্ষার ফি-র উপরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অস্তিত্বের নির্ভর।

এ হেন সরস্বতীর বড় মন্দিরে উতঙ্ক একদিন গিয়া উপস্থিত হইল। পাখা খুলিয়া দিয়া আরাম কেদারায় এক অধ্যাপক টান হইয়া পড়িয়াছিলেন—অধ্যাপনা ও ভোজনান্তে তিনি সাতিশয় ক্লান্ত।

উতঙ্ক বলিল—স্তর—

অধ্যাপক বলিলেন—কি, চাঁদা নাকি ?

উতঙ্ক বলিল—না ব্লেকের সেই কবিতাটা—

—কোন্ কলেজের ছাত্র ?

কলেজের নাম শুনিয়া অধ্যাপক বলিলেন বি, এ পাশ করে এখানে এসে ভর্ত্তি হ'য়ো, তখন দেখা যাবে ।—এই বলিয়া তিনি পাশ ফিরিলেন, বলিষ্ঠ সেগুন কাঠের চেয়ার মচ্ মচ্ করিয়া উঠিল।

ছাত্র-সমাজে উতঙ্কের অসীম প্রতিষ্ঠা। কোন কলেজে ধর্ম্মঘট করিতে হইলে ছাত্ররা উতঙ্ককে Requisition করে। উতঙ্ক কলেজে ঢুকিতেই অধ্যাপকেরা আতঙ্কে পলায়ন করে, কলেজ আপনি ছুটি হইয়া যায়—Strike successful হয়।

পরীক্ষা আসিয়া পড়িয়াছে—বাংলা দেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। নূতন পটল ও পরীক্ষার Suggestion চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে, পথের মোড়ে হকারেরা রেস ও ম্যাট্রিক পরীক্ষার Tip হাঁকিতেছে। পিতারা রেসের ও পুত্রেরা পরীক্ষার Tip সংগ্রহ করিতেছে। উভয় দলেরই ভবিষ্যৎ সমান উজ্জ্বল !

এই সময়ে—কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপকের মৃত্যু হইল। মুমূর্ষু অবস্থায় সজ্ঞানে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল—আমরা অনেকে সঙ্গে গেলাম। গঙ্গাজলে অর্দ্ধনিমগ্ন অবস্থায় তিনি ইষ্টনাম জপ করিতেছেন, যে কোন মুহূর্ত্তে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে।

এমন সময়ে দেখিলাম উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া উতঙ্ক আসিতেছে। বেচারী নিশ্চয় অধ্যাপকের কাছে নানাভাবে ঋণী—হয়তো দেখিতে পাইবে না আশঙ্কা করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। আর এমন ছাত্র-প্রিয় অধ্যাপক, ছাত্ররা কেনই বা না ছুটিবে !

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—এখনো আছেন ভয় নাই।

উতঙ্ক বলিত—নাঃ ভগবান আছেন!

উতঙ্ক কাছে আসিয়া শুধাইল—কোথায়?

দেখাইয়া দিলাম।

অধ্যাপকের তখন শেষ মুহূর্ত। উতঙ্ক কাছে যাইতেই সকলে অবচেতন ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার সে দিকে দৃষ্টি নাই। সে অধ্যাপকের মুখের কাছে নত হইয়া বসিল। তিনি তখন রামনাম জপ করিতেছিলেন, উতঙ্ককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া শুধাইলেন—কি?

উতঙ্ক বলিল—স্যর, ওয়ার্ডস্বার্থের সেই কবিতাটা—ওই যে সেই লণ্ডন, ১৮০২—ওটার কিছু Suggestion? আমরা সকলে হায় হায় করিয়া উঠিলাম। অধ্যাপকের মুখ ঈষৎ ফাঁক হইল, যেন কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—কিন্তু ওষ্ঠাধর আবার বন্ধ হইল, চক্ষুতারকা স্থির হইয়া গেল—প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

উতঙ্ক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—Too late! Too late! তারপর সখেদে নিজের মনে বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল—"Professor thou shouldst be living at this hour! Students have need of thee!"

সকলে তাহার উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইল—কিন্তু আমি মনে মনে বলিলাম—ধন্য উতঙ্ক তোমার জ্ঞানস্পৃহা। তোমার উদাহরণ দেখিয়াই বাঙালী অধ্যাপকদের চৈতন্যের অর্দ্ধচন্দ্রোদয় সম্ভব হইয়াছে।

গণক

এপ্রিল মাসের কলিকাতা সহর। দুপুরের রোদে রাস্তার পিচ গলিয়া জুতার ছাপ বসিয়া যাইতেছে, পথে লোকজন নাই, ট্রাম-বাসের চলাচল কমিয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে একখানা জলঢালা ট্রাম গাড়ী লাইনের উপর জল ঢালিয়া চলিয়া যাইতেছে—তৃষিত কুকুরটা আসিয়া পৌঁছিবার আগেই সে জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, পথের পাশের জলের কলের সঙ্কীর্ণ ছায়াতে একটা কুকুর জিহ্বা বাহির করিয়া পড়িয়া আছে, রোদের দিকে চাহিলে চোখে জ্বালা ধরিয়া যায়।

এমন সময়ে ওই লোকটি কোথায় চলিয়াছে? নিশ্চয় কোন গুরুতর বিপদে পড়িয়াছে, নহিলে সখ করিয়া কে পথে বাহির হয়! হয় তো বাড়ীতে ব্যাধি আঁটিয়া উঠিয়াছে, কিম্বা হয়তো হঠাৎ মনে পড়িয়াছে বেলা ৩টার মধ্যে জীবনবীমার কিস্তি দাখিল করিতে না পারিলে তামাদি হইবে, নতুবা এহেন অবস্থায় কে বাহির হয়।

লোকটা কাছে আসিলে দেখা গেল মুখে শঙ্কার ছাপ নাই, বরঞ্চ একটা লাভলোলুপ কৌতূহলের ভাব' সে ভেজা গামছাখানি মাথা হইতে নামাইয়া মুখটা মুছিয়া লইল, গামছা যেমন দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া যাইতেছে—তেমনি আবার দেখিতে দেখিতে ঘামে ভিজিয়া উঠিতেছে।

এমন সময়ে লোকটি থমকিয়া দাঁড়াইল, মুখের প্রসন্নতা কোথায় গেল। অদূরে কার দিকে তাকাইয়া দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ কবিতে লাগিল? ব্যাপার কি? অদূরে আর একজন লোক ভেজা গামছা মাথায় এইদিকে আসিতেছে।

দ্বিতীয় লোকটি কাছে আসিয়া পড়িলে প্রথম ব্যক্তি শুধাইল—কি ইস্কুল পালিয়ে নাকি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—একরকম তাই, এই আস্‌ছি বলে' সরে পড়েছি। আপনি?

প্রথম ব্যক্তি বলিল—আর বল কেন ভাই? বাড়ীতে কঠিন ব্যামো, কিছুতেই বেরুতে দেয় না, শেষে ডাক্তার ডাকবার নাম করে, বুঝলে কিনা!

—চলুন, চলুন। নইলে আবার সেই টেকো-টা এসে পড়বে।

প্রথম বলিল—কিন্তু সেই দাঁত-নড়াকে ঠকাবে কি করে? এতক্ষণে দুই হাজার গুণে ফেলেছে।

—তবে তাড়াতাড়ি চলুন।

তখন দুইজনে পরস্পরের মিলনে অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে এবং টেকো ও দাঁত-পড়ার ভয়ে শঙ্কিত মনে চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই কলের ছায়ায় শোয়া কুকুরটা হঠাৎ তাদের চোখের দিকে তাকাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং ছুটিতে ছুটিতে গিয়া ট্রামের খুঁটির ছায়াতে দণ্ডায়মান কর্পোরেশনের একটা ষাঁড়ের পেটের তলের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়া ধুঁকিতে লাগিল।

২

পাঠক এই দুই ব্যক্তিকে চেনো কি? চেনো না। পরীক্ষাজীবী বাংলাদেশের একটি বৃহৎ অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইয়া গেলে চঞ্চল হইয়া ওঠে।

প্রথমে ঠেলাগাড়ীওয়ালারা চঞ্চল হয়—রাশি রাশি বেঞ্চি টেবিল বহন করিবার আশায়, তারপরে দপ্তরীরা, কেরাণীরা, আফিসের বাবুরা,—নানারকম প্রয়োজনে, আদালতের উকীলেরা,—পরীক্ষা-গৃহে 'গার্ড' দিবার জন্য, (উকীলদের নিন্দা করিতেছি না, শাস্ত্রেই বলিয়াছে পুরুষস্য ভাগ্যং। বাঙালীর অদৃষ্টের দুই মেরু, দারোয়ানী ও

মন্ত্রীত্ব; একটু অদল বদলে কত প্রভেদ); তারপরে অভিভাবকের দল, পরীক্ষকের দল, সবশেষে ছাত্রের দল, পরীক্ষা শেষ হইবামাত্র নম্বর জানিবার জন্ম উমেদারের দল, তাহারা প্রায়ই নিরাশ হয় না—যদিচ পরীক্ষার নম্বর বলিবার হুকুম নাই—তাহা strictly confidential, কিন্তু পরীক্ষকরা মর্ম্মজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে strictly confidential মানেই—'অসঙ্কোচে বলিয়া দিবে' এবং একেবারে অস্তিমদৃশ্যে ঢাকুরিয়া লেকের মাছের দল—পরীক্ষার ফল বাহির হইলে যখন ফেল-করা সন্তান সেনার দল ঝাঁকে ঝাঁকে লেকে ঝাঁপ দিয়া দেহ ত্যাগ করে—'জোগাতে মাছের খাদ্য।'

সম্প্রতি একটি নূতন দল সৃষ্টি হইয়াছে—এঁদের নাম গণক। পরীক্ষার খাতা দেখা হইয়া গেলে ইঁহারা খাতার নম্বরগুলি মিলাইয়া দেখেন, যোগফলে ঠিক আছে কিনা। খাতাপ্রতি দক্ষিণা হয়তো আধ পয়সা কি পৌণে এক পয়সা। কিন্তু এমনি ইঁহাদের অধ্যবসায় যে তিলে তাল করিয়া কেহ দেড়শ, কেহ দুইশ টাকা রোজগার করেন। বাঙালী এখনো নিজের জাতীয় বীরদের না চিনিয়া বৃথা রবার্ট ব্রুস প্রভৃতি বিদেশীর নাম করিয়া থাকে।

এই গণকদের অসাধ্য বলিয়া কিছু নাই। কাঠফাটা রোদ, গভীর রাত্রি, মুমূর্ষুর শয্যা, ইস্কুলের বিধান কিছুতেই ইহাদের নিরস্ত করিতে পারে না। যারা হেড একজামিনারের বাড়ীর কাছে থাকে তারা বোধ করি নিজেদের স্বর্গের অধিবাসী মনে করে। তেল মাখিতে মাখিতে 'ক' বাবু আসিয়া বলিলেন—স্যর, এই একবার এলুম! আছে নাকি, কাগজ? আছে? দিন, দু' পুঁটুলী গুণে যাই।

দু' পুঁটুলী গুণিয়া, তৈলাক্ত মস্তক স্নিগ্ধ করিয়া সন্দিগ্ধ গোয়ালার দুধের বিলের সুরাহা করিয়া 'ক' বাবু গঙ্গাস্নানে প্রস্থান করিলেন।

'খ' বাবু বড়বাজার হইতে কিছু 'খট্‌মলে'র কিনা ছারপোকার

অঙ্কুর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরীক্ষা আরম্ভ হইবামাত্র সেগুলি তিনি নিজের শয্যায় ছাড়িয়া দিয়াছেন—এতদিনে তাহারা সাবালক হইয়া দংশন সুরু করিয়াছে, মাঝ রাতে 'খ' বাবুকে ঘুম ভাঙাইয়া জাগাইয়া দেয়। তিনি এলার্ম ঘড়িতে বিশ্বাস করেন না—হাজার হোক তা মানুষের তৈয়ারী—আর এ একেবারে স্বয়ং ভগবানের সৃষ্টি। 'খ' বাবু হেড এগজামিনারের বাড়ীতে আসিয়া কড়া নাড়িয়া দরজা খুলিতে বাধ্য করিয়া গণনায় বসিলেন। মেয়ের বিবাহের টাকা জমাইতেছেন। মেয়ে সদ্যজাত। সে কালক্রমে তিলে তিলে তিলোত্তমা হইবে, অমনি সেই সঙ্গে বছরে বছরে গণনার টাকা তিলে তিলে তাল হইয়া উঠিবে। 'খ' বাবু গণিতের এম, এ, বিয়েতে অর্থনীতিতে অনার্স পাইয়াছিলেন।

৩

ইত্যবসরে প্রথম বাবু ও দ্বিতীয় বাবু (এখন বাবু বলা যাক্) হেড এগজামিনারের বাড়ীতে পৌঁছিয়া অস্ত্রাগারে অর্থাৎ যে ঘরে পরীক্ষার খাতা থাকে গিয়া পৌঁছিলেন। টেকো ও দাঁত-পড়া আসে নাই দেখিয়া এবং অগণিত অনেক খাতার স্তূপ দেখিয়া দু'জনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দু'জনে ছুটিয়া গিয়া যতগুলি সম্ভব (এঁদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়) পুঁটলী টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন। প্রথম বাবুর বয়স ষাট, দ্বিতীয় বাবুর পঞ্চাশ।

দুইজনে নিঃশব্দে মনে মনে গণনা করিয়া চলিলেন; ৩ আর ২ পাঁচ আর ৪ নয়, আর ৩॥ সাড়ে বার ইত্যাদি।

এমন সময় ঘরের এক কোণ হইতে শব্দ হইল চুণ না সুরকি?

দু'জনে চমকিয়া উঠিলেন—লোক নাই কথা বলে কে?

এক মুহূর্ত্ত পরে সু-উচ্চ খাতার প্রাচীরের মধ্যে মানুষের মাথা জাগিয়া উঠিল। দু'জনে বিস্মিত ক্রোধের সঙ্গে দেখিল দাঁতপড়া।

প্রথমবাবু শুধাইলেন—কি বলছিলেন ?

—বলব আর কি ! আপনাদের কথা শুনে মনে হ'ল বুঝি পাওনাদার এসেছে। জানেন তো একখানা বাড়ী করেছি। চুণ আর শুরকিওয়ালারা তাগিদ করছে—হঠাৎ মনে হ'ল তাদেরই কেউ বুঝি এসেছে।

দ্বিতীয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কত খাতা গুণলেন ?

—কত আর ? মোট দেড় হাজার।

দেড় হাজার শুনিয়া প্রথম বাবু এত বড় হাঁ করিয়াছিলেন যে চোয়ালের হাড় আর স্বস্থানে নামিতে চায় না।

দ্বিতীয় বাবু শুধাইলেন—মুখ যে শুকিয়ে গিয়েছে, এসেছেন কখন্ ?

—সেই সকাল সাড়ে চারটায়।

—খেলেন কি ?

—খাবো আর কি ? চারটে চিঁড়ে আর কিছু গুড় চাদরে বেঁধে এনেছিলাম—তাই।

প্রথম বাবুর চোয়াল এতক্ষণ যথাস্থানে নামিয়াছে। তিনি শুধাইলেন—অত সকালে ওঠেন কি করে ?

কি আর বল্‌বো ! কর্পোরেশনের স্ক্যাভেঞ্জারদের একজনকে বলে' রেখেছি, বাড়ীর পাশ দিয়ে গাড়ী নিয়ে যাবার সময়ে ডেকে দেয়।

দাঁতপড়ার দুটি ভূতপূর্ব্ব দাঁতের অবকাশ দিয়া কথার অনেকটা অংশ বায়ুরূপে বাহির হইয়া যায়, সব কথা বোঝা যায় না, তবে যেটুকু বোঝা যায় তাহাতে মনে হয় তিনি একজন 'সুপারম্যান' !

দাঁতপড়া বলিল—আরে শুনেছেন সুখবর ! টেকো আর আসবে না !

দুইজনে কোরাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—কেন ? কেন ?

কালরাতে পড়ে গিয়ে তার দুই পা ভেঙে গিয়েছে, মাথায় চোট লেগে ব্রেন ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়েছে।

টেকো আর আসিতে পারিবে না, তাহার দিক হইতে আর অর্থ ক্ষয়ের আশঙ্কা নাই শুনিয়া, দু'জনে সত্যই তাহার জন্ম সমবেদনা বোধ করিল।

এমন সময়ে বাহিরে মোটরের শব্দ হইল। বোধ করি নূতন খাতার স্তূপ আসিয়াছে মনে করিয়া সকলে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তাহারা বাহিরে গিয়া দেখিল এম্বুলেন্সের গাড়ী হইতে জন চার লোক টেকোকে সযত্নে টানিয়া বাহির করিতেছে—একজন নার্স তাহার মাথায় বরফের থলি ধরিয়া আছে—আর একজন ডাক্তার তাহার নাড়ি ধরিয়া দণ্ডায়মান।

দাঁতপড়ার দল জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি?

টেকো আর্ত্তস্বরে বলিল—কাগজ গুনতে এলাম।

কি সর্ব্বনাশ!

—আপনি যে আহত।

টেকো বলিল—সেই জন্যই তো এম্বুলেন্সে আসতে হ'ল।

দাঁতপড়া বলিল—শুনেছি আপনার ব্রেন ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়ে গিয়েছে।

টেকো বলিল—আরে খাতাগুণতে কি ব্রেন লাগে।

ডাক্তার বলিল—ব্রেণ দিয়ে মাথার খুলির খানিকটা জায়গা মিছামিছি ভর্ত্তি করে রাখা হয়েছে।

টেকো বলিল—তবে ব্রেন একেবারে নষ্ট হয়নি। এই দেখুন না ওই থার্ম্মোফ্লাস্কে করে ভরে নিয়ে এসেছি। দরকার হ'লে ব্যবহার করবো।

তারপরে সে ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া বলিল—ডাক্তারবাবু ব্রেন বেরিয়ে যাবার পর থেকে মাথা বেশ হাল্কা ব'লে মনে হচ্ছে। তখন সকলে মিলিয়া টেকোকে ঘরে ঢকাইল। টেকো মেঝের উপরে, শুইয়া

পড়িয়া কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া খাতা গুণিতে লাগিল ৩ আর ৫ আট আর ২॥ সাড়ে দশ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বাবু প্রথম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি যে চুপ?

প্রথমবাবু তবু নিরুত্তর।

তখন তাকাইয়া দেখে প্রথমবাবুর বিস্ময়ের হাঁ এত বড় হইয়াছে যে আবার চোয়াল আটকাইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় বাবু বলিল—ডাক্তারবাবু এদিকে যে বিপদ্। ডাক্তার বলিল—আমার রুগী এখন-তখন, অন্যদিকে মন দেবার সময় আমার নেই। আপনারা বরঞ্চ কোন ছুতোরের কাছে যান—হাতুড়ি ঠুকে ঠিক করে' দেবে।

তখন অগত্যা দুইজনে প্রথমবাবুর অবাধ্য চোয়ালের একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এদিকে মুমূর্ষু টেকো ২ আর ৩ পাঁচ আর ৭॥০ ১২॥০ করিয়া খাতা গুণিয়া চলিল।

সঙ্গীরা ভাবিতে লাগিল—ধন্য কর্ত্তব্যজ্ঞান!

অনেকদিন পরে পথে হঠাৎ রামতনুর সঙ্গে দেখা, জিজ্ঞাসা করিলাম, একি রামতনু, এতদিন দেখিনি কোথায় ছিলে ?

সে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া উত্তর দিল,—আজ্ঞে না, একটু কাজ ছিল।

কাজ! তবে বোধ হয় বিবাহ করিতে গিয়াছিল!

বলিলাম—কি বিবাহ নাকি ?

সে বলিল—আজ্ঞে, না, একটা ডিগ্রির চেষ্টায়।

অবাক হইলাম—রামতনু আবার কি ডিগ্রি লাভ করিবে !

আটবার চেষ্টা করিয়া এম, এ, পাশ করিয়াছে সে।

—ডিগ্রি ? কি ডিগ্রি, বাপু ?

সে বলিল—আজ্ঞে, পি এইচ-ডি।

অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল—

—পি-এইচ, ডি, হোমিও ?

লজ্জিত রামতনু বলিল—আজ্ঞে না, ডক্টর অব্ ফিলজফি।

—দিল কে ?

—বিশ্ববিদ্যালয়।

একেবারে বসিয়া পড়িলাম। মাটিতেই বসিতাম, কিন্তু পাশে এক-খানা বেঞ্চি ছিল, টলিতে টলিতে গিয়া তার উপরে বসিলাম। রামতনু বোধ হয় মনে করিল আমি তাহার বিদ্যার ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া বসিতে বাধ্য হইলাম। বিদ্যার ধাক্কা কিনা জানি না, বিস্ময়ের ধাক্কা যে লাগিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মনে পড়িল রামতনুর মত নিরেট মূর্খ আমি দুটি দেখি নাই।

ম্যাট্রিকুলেশন হইতে এম, এ পাশ করিতে যে ছয় বছর লাগে রামতনু তাহাকে বিশ বছরে পরিণত করিয়াছে, ইস্কুলে সে কয় বছর অধ্যয়ন করিয়াছে সে ইতিহাস আমার অজ্ঞাত, এখন বয়স তাহার চল্লিশের উপরে। সেই রামতনুর পি-এইচ-ডি ডিগ্রিলাভ। নাঃ জগতে বিস্ময়ের অন্ত নাই দেখিতেছি।

রামতনুকে পাশে বসাইয়া তাহার ডিগ্রি লাভের ইতিহাস জানিয়া লইলাম।

রামতনু এ রহস্য প্রকাশ না করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কথা রাখিতে পারিলাম না—সাধারণের, বিশেষ ডিগ্রিলাভার্থীদের হিতার্থে প্রকাশ করিলাম—আশা করি ইহাতে বাঙালী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্রদের প্রভূত উপকার হইবে।

আমি [রামতনু] এম, এ পাশ করিয়া দেখিলাম যে একটা পি-এইচ-ডি ডিগ্রি না পাইলে জীবনই বৃথা, চাকুরি তো দূরের কথা, কেহ বসিতেও বলে না। কিন্তু ডক্‌টরেট লাভ করা তো সহজ নয়। অবশেষে গুরুর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম, কিন্তু আমাকে কেহ শিষ্য করিতে রাজী হয় না। কেহ বিদ্যার অভাব বলে, কেহ বুদ্ধির অভাব বলে, কেহ টাকার অভাব বলে! একজন পরামর্শ দিল ডক্‌টরেটের পরিবর্ত্তে মাথার চুল পাকাও, লোকে বিজ্ঞ মনে করিবে। আর একজন বলিল—আমেরিকা হইতে টাকা দিয়া একটা ডিগ্রী আনাইয়া লও। শ্যামবাজারের খুড়ো বলিল—আরে ছাই, গবেষণা সুরু করিয়া দাও। মাথা-মুণ্ডু যাহা মনে আসে লিখিয়া যাও, পুরু কাগজে ছাপিয়া ভাল করিয়া বাঁধাও, সোনার জলে নাম লিখিয়া দাও, এমন কিছুদিন করিতে থাকো, অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় তোমার বিদ্যার নর্দ্দমা বন্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় ডক্‌টরেট দিয়া তোমাকে থামাইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু লিখিব কি? অবশ্যই ভুল লিখিব—কিন্তু ভুল লিখিতে হইলেও কিছু লিখিতে হইবে—তাই বা পাই কোথায়?

প্রায় যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তখন হাঠাৎ একদিন কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে তাহার সঙ্গে দেখা। একেবারে চারি চক্ষের মিলন। গুরু শিষ্য পরস্পরকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিল।

তিনি বললেন—ডক্‌টরেট চাও ?

তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন।

তারপরে আরম্ভ করিলেন—বৎস, আরামতন্ম্ (এই উপসর্গটি আমার গুরুর দান) শোন, জ্ঞান বলিয়া কিছু নাই, জ্ঞান সৃষ্টি করিতে হয়। যেমন ইট দিয়া নানারকমের ইমারত তৈয়ারি করা যায়, তেমনি বর্ণমালার সমাবেশে জ্ঞানজগতের সৃষ্টি। আশাকরি তুমি বর্ণমালা জানো, কাজেই জ্ঞানও তোমার আয়ত্ত। এখন কেবল উপযুক্ত গুরুর অভাব।

আমি জানাইলাম যে তাঁহাকে পাইয়া তো সে অভাবও পূর্ণ হইয়াছে। তিনি বলিলেন—তোমার যে শুধু গুরুর অভাব পূরণ হইয়াছে তাহা নয়, আমারও উপযুক্ত শিষ্যের অভাব মিটিয়াছে।

তারপর তিনি সেই ধূমাচ্ছন্ন নিভৃত কক্ষে বসিয়া আমাকে সরল থীসিস্ রচনা প্রণালী শিক্ষা দিলেন। নীহারিকা হইতে যেমন নক্ষত্রের সৃষ্টি, সেই ধূম হইতে আমার জ্ঞানের ধ্রুবনক্ষত্র ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে লাগিল।

তিনি বলিলেন—থীসিস্ রচনা প্রণালীর কয়েকটি মূলসূত্র আছে। প্রথম, থীসিসকে যতদূর সম্ভব নীরস করিবে। ইহাতে কত সুবিধা দেখ,—সাধারণ পাঠক ইহা পড়িবে না, আর যত কম লোকে পড়িবে তত তোমার ফাঁকি ধরা পড়িবার আশঙ্কা কম। তার পরে দেখ—পরীক্ষকগণও তোমার নীরস মরুভূমি তাড়াতাড়ি পার হইবার জন্য দ্রুত পাতা উল্টাইয়া যাইবেন, কাজেই সাপ, ব্যাঙ কি আছে লক্ষ্য করিবার সময় পাইবেন না। আবার দেখ, থীসিস যতবেশি শুষ্ক হইবে তত তোমার সম্বন্ধে পরীক্ষকের ধারণা উচ্চ হইবে, কারণ জ্ঞান জিনিষটা সহজ নয়। সাত্ত্বিকজ্ঞান শুষ্ক

হরিতকীর মত,—কঠিন, শুষ্ক, নীরস, কটু, শাঁস আছে কি নাই; থাকিবার মধ্যে আছে প্রকাণ্ড একটা বীচি!

দ্বিতীয়—থীসিসকে যত দীর্ঘ পারো করিবে। বাল্যকাল হইতে লোকে শুনিতে আরম্ভ করে যে জ্ঞানসমুদ্র অপার, এমন কি স্বয়ং নিউটনও নাকি তীরে বসিয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ ছাড়া আর বেশি কিছু করিতে পারেন নাই। নিরেট পাঁচ শ' পাতার টাইপ করা ফুলস্কেপ কাগজের একটা পিরামিড দেখিলে এমন কোন্ দুঃসাহসী পরীক্ষক আছে যাহার হৃৎকম্প না উপস্থিত হইবে।

তৃতীয়—মনে রাখিবে শাস্ত্রের চেয়ে ভাষ্য সর্ব্বদা বড় হয়। অতএব একছত্র লিখিয়া অন্তত ত্রিশছত্র তাহার ফুটনোট দিবে। ছোট, বড়, মাঝারি, নানারকম টাইপ দিয়া, নানা ভাষায় ফুটনোট থাকে থাকে নামিয়া গেলে আপনিই পরীক্ষকের চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিবে। আর যদি কোন অরসিক সত্যই পড়িবার চেষ্টা করে, তবে বেশি দূর পড়িতে পারিবে না, কারণ ওই ক্ষুদে অক্ষরের বর্জ্জাইস টাইপ পড়িতে পড়িতে সে নিশ্চয় অন্ধ হইয়া যাইবে।

চতুর্থ—এমন বিষয় নির্ব্বাচন করিবে যাহাতে সাধারণের কোন আগ্রহ নাই। যে বিষয়ে কেহ জানে না, জানিতেও চাহে না, সেই বিষয়ে থীসিস্ যেমন চমৎকার হয়, এমন আর কিছুতে নয়। খবরদার, জীবনের সঙ্গে থাসিসের যোগ করিতে কখনো চেষ্টা করিও না।

বিশেষ করিয়া দৃষ্টি রাখিও, তোমার থীসিসে যেন সহজ সত্য না থাকে, জীবনের ছায়া না থাকে, জ্ঞানের তৃষ্ণার পানীয় না থাকে, মৌলিক দৃষ্টিকে সর্ব্বদা এড়াইয়া চলিবে, কখনো সুবোধ্য ভাষা ব্যবহার করিবে না, এবং কিছুতেই যেন থীসিসটি সুখপাঠ্য ও সরল না হয়। থীসিসের ভাষা প্রতি ছত্রে ছত্রে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে থাকিবে, প্রথম

কয়েক ছত্রের আঘাতেই পরীক্ষকের দুপাটি দন্ত নির্দন্ত হইবে, তারপরে অনায়াসে সবটা তিনি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিবেন।

এইরূপে প্রাথমিক ভূমিকা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন—বৎস, এবার নিম্নের কয়েকটি ছত্রকে তুমি থীসিসে পরিণত কর :—

"একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই হাড় বাহির করিতে পারিল না, অবশেষে সে এক বকের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।"

ব্যস্, এইবার পাণ্ডিত্য, অভিধান, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও উপযুক্ত পরিমাণে অজ্ঞতা মিশাইয়া এই কয়েক ছত্রকে থীসিসে পরিণত করিয়া ফেল।

বাঘ ও বক শব্দের উপরে জোর দিবে। কত রকম বাঘ ও বক আছে তাহার সুদীর্ঘ তালিকাপ্রস্তুত কর, তারপর পৃথিবীর সাহিত্যে কোথায় কোথায় বাঘের ও বকের উল্লেখ আছে সংগ্রহ কর, তারপরে বাঘ ও বকের উল্লেখ একত্র কোথায় আছে সংগ্রহ কর—দেখিবে ইহাতেই প্রায় দেড়শত পাতা ভরিয়া যাইবে।

তার পরে দেখ—এই গল্পটির মূলে ঈসপের লেখাতে বাঘ ছিল 'উল্ফ্', বাংলাদেশে আসিয়া তাহা হইয়াছে 'বাঘ', এখন এই সূত্রকে অনুসরণ করিয়া আরও পঞ্চাশ পাতা লিখিবে। এখানে গ্রীসের ও বাংলাদেশের ভূগোল লইয়া একটা গোলমাল পাকাইয়া তুলিবে। বলিবে যে বাংলাদেশের রয়াল বেঙ্গল টাইগারের প্রভাবে গ্রীক 'উল্ফ্' 'বাঘ' হইয়া উঠিয়াছে। প্রসঙ্গত সুন্দরবন, পর্তুগীজ দস্যু ও পর্তুগাল সম্বন্ধে কয়েক পাতা লিখিবে। তারপরে বাঘ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ফুটনোটে লিখিবে—'হাজারিবাগ' নামের ব্যুৎপত্তি কি ? নিশ্চয় কোন সময়ে এখানে এক হাজার ব্যাঘ্র ছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিবে এখনো ২।৪টি বাঘ দেখা যায়।

এই ফুটনোটের ফুটনোটে বলিবে 'বাগবাজার'-এর মৌলিক নাম 'ব্যাঘ্রবজ্র', ইহার সঙ্গে মহাযান সম্প্রদায়ের 'বজ্র' শব্দের যোগ আছে; এখানে পুরাকালে একটি বৌদ্ধমঠ ছিল, বর্গীদের অত্যাচারে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তুমি একখানি প্রাচীন তাম্রলিপি হইতে এসব কথা জানিতে পারিয়াছ, তাম্রলিপিখানি এতদিন তোমার কাছেই ছিল, সম্প্রতি খোয়া গিয়াছে। তারপরে 'বক' সম্বন্ধে লিখিবে, মহাভারতের ধর্ম্মরূপী বকের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া যেখানে যত বক পাইয়াছ উল্লেখ করিবে।

তারপরে এই গল্পের রাজনৈতিক ভাষ্য করিবে—ইউরোপ হইতেছে বাঘ, এশিয়া বক, ইউরোপ নিজের বিপদউদ্ধার করিয়া দিবার জন্য এশিয়ার কাছে আসিয়া অনুরোধ করিতেছে। এইখানে সাম্রাজ্যবাদ, বাণিজ্যবাদ, কম্যুনিজম্, জাতীয়তা প্রভৃতি বিষয় লইয়া একটা গোলক-ধাঁধাঁর সৃষ্টি করিবে।

এইরূপে উপদেশ দিয়া গুরু বলিলেন,—যাও বৎস, এখন বাড়ী গিয়া থীসিস্ লিখিতে আরম্ভ কর. আমার কথা মনে রাখিলে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইবে।·

গুরুর বাক্য স্মরণ করিয়া আমি ছয় মাস পুস্তকাগার হইতে পুস্তকাগারে ঘুরিয়া সাড়ে সাতশ পাতার এক জগদ্দল থীসিস লিখিয়া ফেলিলাম—এবং অবশেষে একটি শুভদিন দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করিয়া দিলাম।

চারমাস পরে একদিন চিঠি পাইলাম যে আমার থীসিস মনোনীত হওয়ায় আমি ডিগ্রিলাভ করিয়াছি।

রামতনু বলিল যে তিনজন পরীক্ষকই একবাক্যে আমাকে প্রশংসা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর লিখিয়াছেন, "এরূপ অত্যাশ্চর্য্য থীসিস্ যে লিখিত হইতে পারে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস

করিতাম না। বাঙালী ছাত্রটির মাথার মধ্যে কি আছে দেখিতে কৌতূহল হয়।"

পাঞ্জাবের প্রফেসর বলিয়াছেন—

"What Bengal thinks today, the rest of India will think to-morrow."

"—আশা করিতেছি কিছুদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রেরা এবার কি করিয়া থীসিস লিখিতে হয় তাহা বাঙালীর কাছ হইতে শিখিবে।"

কলিকাতার প্রফেসার লিখিয়াছেন,—"অহো কি প্রগাঢ় জ্ঞান; কি সারগর্ভ চিন্তা, অহো কি হৃদয়গ্রাহী ভাষা, অহো ইতিহাসের অন্ধকার গুহার মধ্যে কি সাহসের সহিত প্রবেশ। এই একখানিমাত্র গ্রন্থ রাখিয়া বাংলাসাহিত্যের আর সব পুড়াইয়া ফেলা চলে। এতদিন পরে বাঙালীর দুর্নাম ঘুচিবে—স্কলার বলিয়া খ্যাতি বাড়িবে। আশা করি—বিশ্ববিদ্যালয় এই পণ্ডিত-প্রবরকে একখানি চেয়ার দিয়া নিজেকে ধন্য করিবেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রামতনু থামিল। আমি কাঁদিব কি হাসিব স্থির করিতে না পারিয়া বিড়ি টানিতে লাগিলাম।

শেষে বাড়ী ফিরিয়া স্থির করিলাম বাঙালী জাতির, বিশেষ বাঙালী ছাত্রদের হিতার্থে ইহা প্রকাশ করা উচিত। তাই ঠিক যেমনটি শুনিয়াছিলাম তেমনি লিখিয়া কাগজে দিলাম। কেবল রামতনুর গুরুর নাম চাপিয়া গেলাম, কারণ তিনি সম্প্রতি দেহরক্ষা করিয়াছেন। রামতনুর নামটাও ছদ্মনাম। আর এই প্রবন্ধের লেখকের নামটাও আমার নাম নয়, আমার সত্যনাম গোপন করিয়া এই বেওয়ারিশ নামটা ব্যবহার করিলাম।

অর্থ-পুস্তক

কিছুদিন হইল অজীর্ণ ও দারিদ্র্যে ভুগিতেছি। বন্ধুরা বলিল—ঔষধ খাও। চিকিৎসকের কাছে গিয়া ঔষধ লইলাম, মূল্য দিলাম। ঔষধ খাইলাম, বলা বাহুল্য অজীর্ণ সারিল না এবং দারিদ্র্য বাড়িল। পাঠক, তুমি বলিবে যে ভুল ঔষধ খাইয়াছি। কিন্তু, না, ঔষধ ঠিকই হইয়াছিল—নচেৎ অজীর্ণ বাড়িবে কেন?

অজীর্ণ ও দারিদ্র্যের গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে পড়িয়া যে অবশ্যম্ভাবীর মুখে ভাসিয়া চলিয়াছি সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া এক স্বপ্ন দেখিলাম—স্বপ্নে এক দেবীর আবির্ভাব হইল।

আমি শুধাইলাম—মাতঃ, তুমি কে?

দেবী বলিলেন—বৎস, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? ভাল করিয়া দেখ।

ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিলাম—ইনি দেবী সরস্বতী। পত্রিকার পাতায় বীণাবাদিনীর যে মূর্ত্তি দেখা যায়—একেবারে ঠিক সেই মূর্ত্তি। যায় সেই ধবধবে শাদা হাঁসটি পর্য্যন্ত।

আমি বলিলাম—মাতঃ অপরাধ লইও না—প্রথমটা ঠিক ঠাহর করিতে পারি না।

তিনি বলিলেন—তোমার আর দোষ কি? ইস্কুলে কলেজে তো আমার চর্চ্চা কর নাই। না চিনিবারই কথা।

আমি বলিলাম—কলেজের দোষ দিও না, ততদূর পৌঁছাইতে পারি নাই।

তার পরে একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম—তা আপাতত আমার কাছে কেন জানিতে পারি কি ?

তিনি বলিলেন—বৎস তোমার দুঃখে মন বড় বিচলিত হইয়াছে—তাই আসিয়াছি।

আমি পুনরায় শুধাইলাম—মাতঃ, দীনের নির্বুদ্ধিতা ক্ষমা কর—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমি তো কখনো তোমার সাধনা করি নাই—তবে এমন অযাচিত কৃপা কেন ?

দেবী বলিলেন—বৎস, তুমি আমার সাধনা কর নাই বলিয়াই তোমাকে আমি স্নেহ করি। আমার বড় বড় সাধকগণ যে পরিমাণে কালি আমার গায়ে নিক্ষেপ করে এ রকম আর কিছু দিন চলিলেই "সব কাল হো বায়গা।"

এমন সময় দেবীর হাঁসটা শব্দ করিয়া উঠিল।

অমনি দেবী বলিলেন—এই দেখ, আমার বাহনটির দশা দেখ। আমার সাধকগণ উহার পালক ছিঁড়িয়া লইতে লইতে উহাকে দেউলে করিয়া তুলিয়াছে। তুমি যে এ সব কর নাই তাহাতে তোমার প্রতি আমার অনুকম্পা হইয়াছে—তোমার দুঃখের সমাধান করিয়া দিতে আসিয়াছি।

আমি পুলকিত হইলাম।

দেবী বলিলেন, শোন চিকিৎসকেরা বলিয়াছে তোমার আসল ব্যাধি অজীর্ণ, তাঁহারা অজীর্ণের চিকিৎসা করিতেছেন। কিন্তু আমি বলিতেছি, তোমার মূল ব্যাধি দারিদ্র্য, দারিদ্র্যের ঔষধ পড়িলেই অজীর্ণ সারিবে।

আমি বলিলাম দেবতারা যে অন্তর্য্যামী এতদিনে তাহা বিশ্বাস হইতেছে—নহিলে এমন রহস্য কে আর উদ্ঘাটন করিতে পারিত ?

তখন তিনি বলিলেন—বৎস, এবার যাহা বলিতেছি—মন দিয়া

শোন। দারিদ্র্য-ব্যাধি হইতে যদি মুক্ত হইতে চাও—তবে পুস্তক লিখিতে আরম্ভ কর।

পুস্তক!!!

দেবতারা শুধু অন্তর্য্যামী নহেন, পরিহাসরসিকও বটেন।

অন্তর্য্যামী আমার মনের কথা বুঝিলেন। বলিলেন—বৎস, অর্থ-পুস্তক লেখ—দারিদ্র্য দূর হইবে। এই পর্য্যন্ত বলিয়া দেবী মিলাইলেন—স্বপ্নভঙ্গ হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়া ভাবিতে লাগিলাম—ব্যাপার কি? ভাবিলাম একবার স্বপ্নতত্ত্বটি ডাক্তার গিরিনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিব।

বিকালবেলা ডাক্তারের বাড়ীর দিকে যাইবার সময়ে পার্শিবাগানের মোড়ে একখণ্ড কাগজ উড়িয়া আসিয়া আমার হাতে পড়িল।

একি কাকতালীয় যোগ! না—কার্য্যকারণ যোগ! এযে অর্থ-পুস্তকের একখানি পাতা।

ডাক্তারের বাড়ী আর যাওয়া হইল না। তখনই বাড়ী ফিরিলাম এবং তৎক্ষণাৎ সেই পাতাটিকে আদর্শ করিয়া অর্থ-পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

তারপরে দিন নাই, রাত্রি নাই, সকাল নাই, বিকাল নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই—কেবল অর্থ-পুস্তক লিখিয়া চলিয়াছি অর্থাৎ স্কুলের বইয়ের অর্থ লিখিয়া চলিয়াছি।

পাঠক, তোমাকে কিঞ্চিৎ নমুনা না দিয়া পারিতেছি না—এই স্বপ্নাদ্য ঔষধ তোমার কাজে লাগিলেও লাগিতে পারে। মনে রাখিতে চেষ্টা করিও—

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।" এই দুরূহ ও বহুতথ্যপূর্ণ ছত্রটিকে অর্থ-পুস্তকের সুদর্শন চক্রযোগে কেমন ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি দেখ।

বৃষ্টি—মেঘ হইতে পতিত জলধারা বিশেষ

পড়ে—পতিত হয়

টাপুর টুপুর—পাতার উপরে জল-পতন শব্দ

নদেয়—নদীতে, নদীয়াতেও হইতে পারে

এল—আগত হইল

বান—বন্যা, বর্ষার কূলব্যাপী জলরাশি।

পাঠক, দেখিলে তো! কিন্তু এখনও সব দেখ নাই—আরও বিস্ময় জমা আছে। এইবার 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' দেখ।

"ইহা বর্ষার কবিতাও হইতে পারে। আবার ভক্তিধর্ম্মের প্লাবনে নদীয়ার অবস্থার বর্ণনাও হইতে পারে। সে-ক্ষেত্রে 'বৃষ্টি' অর্থ 'চোখের জল', চোখের জল পড়িয়া পড়িয়া নদীয়ায় বন্যা উপস্থিত হইল।"

পাঠক, এই অর্থ লিখিত না হইলে কি বাঙালীর ছেলে কবিতাটি বুঝিতে পারিত! আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি—আমার অর্থ-পুস্তক পড়িবার আগে বাঙালীর ছেলে 'বৃষ্টি' কি জানিত না! 'টাপুর টুপুর' কি জানিত না! আর ওই বহুপ্রচলিত ছত্রটিতে যে এত ভক্তি-তত্ত্ব লুকানো ছিল তাহাই বা কে জানিত! ধন্য আমি! ধন্য আমার লেখনী! এক একবার নিজেই নিজের পিঠ চাপড়াইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু নেহাৎ শরীরসংস্থান বাম।

এখন আমার দরজায় প্রকাশকদের মোটরগাড়ী সর্ব্বদা দণ্ডায়মান। তিনটি মুদ্রাযন্ত্র আমার অর্থ-পুস্তক ছাপিয়া সময় পায় না। হাজার হাজার ক্যান্‌ভাসার আমার বই বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বিক্রয় করিয়া ফিরিতেছে।

আমার দারিদ্র্যব্যাধি সারিয়াছে, কাজেই অজীর্ণও আর নাই। কিন্তু তোমাদের বিজ্ঞানে বলে শক্তির ক্ষয় নাই—রূপান্তর আছে। সুতরাং আমার অজীর্ণ ও দারিদ্র্য বাংলার সুকোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের ঘাড়ে গিয়া চাপিয়াছে। আমি অর্থ-পুস্তকের প্রকৃত অর্থ এতদিনে আয়ত্ত করিয়াছি।

চাকরীস্তান

সমাগত অতিথিদিগের অভ্যর্থনা শেষ করিয়া সিন্ধবাদ তাহার নবমবারের সমুদ্র যাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

সিন্ধবাদ বলিল—বন্ধুগণ ইতঃপূর্ব্বে আমার আটবারের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিয়াছি—এবারে যাহা বলিব তাহা সব চেয়ে বিস্ময়জনক। আমি একটা কথাও বানাইয়া বলিব না, দরকারও নাই, কারণ বাস্তব ঘটনা-ই এমন বিস্ময়কর যে আপনাদের সন্দেহ হইতে পারে আমি অনেকবার সমুদ্রের হাওয়া খাইয়া হয়তো বা সাহিত্যিক হইয়া উঠিয়াছি।

আমি বছর দুই পূর্ব্বে বসোরা বন্দরে দুইখানি জাহাজ নানা পণ্যদ্রব্য বোঝাই করিয়া বাণিজ্যের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমে কিছুদিন আমরা দক্ষিণ দিকে চলিলাম অবশেষে নারিকেল-বনপূর্ণ একটি দ্বীপকে বামে রাখিয়া আমাদের জাহাজ পূর্ব্বোত্তরে চলিতে লাগিল। এইভাবে প্রায় একমাস গেল।

এমন সময়ে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশ মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল—এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষম ঝড় উঠিল। ঝড় ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল—জাহাজের প্রধান নাবিক বলিল যে সে প্রায় ত্রিশ বৎসর জাহাজ চালাইয়া আসিতেছে কিন্তু এমন দানবীয় ঝড় জীবনে আর দেখে নাই। আমরা সকলেই প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া হতাশভাবে ভগবানের নামজপ করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে একটা ভীষণ দমকা আসিয়া আমদের জাহাজের ঝুঁটি ধরিয়া এমন নাড়িয়া দিল যে মুহূর্ত্তে জাহাজখানা শত খণ্ড হইয়া ডুবিয়া গেল। আমি কুচকুচে কালো জলের মধ্যে কোথায় তলাইয়া গেলাম।

যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম সমুদ্রের ধারে বালুর উপরে আমি পড়িয়া আছি। চাহিয়া দেখি সমুদ্র শান্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপর জাহাজখানার কোন চিহ্ন কোথাও নাই। আমার সঙ্গীদের কি দশা হইল দেখিবার জন্ম আমি চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলাম, কত ঘুরিলাম, কত নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কত ইসারা করিলাম, কিন্তু কেহ যে বাঁচিয়া আছে এমন বোধ হইল না।

সঙ্গীদের আশা ছাড়িয়া দিতেই নিজের কথা স্মরণ হইল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে আমি মৃতপ্রায়, পরিধানে একমাত্র বস্ত্র। তখন মনে হইল এ কোথায় আসিয়া পড়িলাম। নিরন্ন নিঃসহায় হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? মনে হইল সঙ্গীদের-ই ভাগ্য ভাল—আমার মত এমন দীর্ঘায়িত যন্ত্রণা ভোগ তাহাদের করিতে হইবে না। ভাবিলাম এখানে তো জন-প্রাণী দেখিতেছি না—আর দেখিলেই বা লাভ কি, তাহারা কি আমার মত বিদেশীকে সাহায্য করিবে? কিংবা হয়তো অসভ্যদের দেশে আসিয়া পড়িয়াছি—তাহারা আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া বালুর উপরে বসিয়া পড়িয়া ভগবান ও সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে দূরে একটি অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলাম। মনে আশার সঞ্চার হইল। আগুন যখন তখন মানুষও অবশ্য আছে। আমি অগ্নি লক্ষ্য করিয়া চলিলাম।

খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেখিলাম সমুদ্রের ধারে একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে আর অনেক লোক দাঁড়াইয়া আছে। শুনিয়াছিলাম কোন কোন দেশে মানুষ মরিলে আগুনে দাহ করে—ভাবিলাম সেইরূপ একটা কাণ্ড ঘটিতেছে।

আমি আরও কাছে আসিলাম। সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত ছিল, কাজেই কেহ আমাকে লক্ষ্য করিল না। দেখিলাম কাঠের ইন্ধন

সাজাইয়া একটি অগ্নিকুণ্ড রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার উপরে কোন মৃতদেহ লক্ষ্য করিলাম না। এমন সময়ে দেখিলাম একজন জীবিত লোককে সকলে মিলিয়া বাঁধিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার আয়োজন করিতেছে। আমি জানিতাম কোন কোন দেশে স্বামী মরিলে স্ত্রীকে সঙ্গে পোড়াইয়া মারা হয়, স্ত্রী মরিলে স্বামীকে অবশ্য পোড়াইয়া মারা হয় না—কারণ বেচারা তো বিবাহের পর হইতেই পুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাবিলাম হয়তো এদেশে স্ত্রী মরিলে স্বামীকে সহমরণে যাইতে হয়—হয়তো বিবাহের সময়ে এমন কোন সর্ত্ত থাকে। কিন্তু সে যাহা হোক, এখানে মৃত কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমি দেখিতে পাইলাম না।

তখন কৌতূহল আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া অগ্রসর হইয়া একজনকে শুধাইলাম,—মহাশয়, এ ব্যক্তিকে কেন পোড়াইয়া মারিতেছেন? আমার প্রশ্নে সে বিস্মিত হইয়া বলিল—আপনি বুঝি বিদেশী?

আমি বলিলাম, আমি বিদেশী নাবিক, জাহাজ ডুবিতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি।

তখন সে বলিল—তবে শুনুন, এ লোকটাকে পোড়াইয়া মারিবার কারণ ইহার চাকরি গিয়াছে। চাকরি গেলে মানুষের জীবনের আর কি সার্থকতা? তখন সে পুড়িয়া মরে—ইহাই এদেশের নিয়ম।

সিন্ধবাদ অতিথিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, বন্ধুগণ এমন বিচিত্র দেশ বা এমন উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব জীবনে আমি কখনো শুনি নাই। অনেক কারণে মানুষে আত্মনাশ করিয়া থাকে, কিন্তু অকৃত্রিম একটা আদর্শের জন্য মানুষে যে আগুনে পুড়িয়া মরিতে পারে—তাহা এই প্রথম শুনিলাম।

আমি তাহাদের দেশের কথা আরও শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহারা আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিল।

তখন তাহারা সকলে মিলিয়া সেই লোকটাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া

শঙ্খ, ঘন্টা, কাঁশর বাজাইতে লাগিল, খই, ধান্য, মুদ্রা বর্ষণ করিতে থাকিল আর সেই লোকটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে বীরের মত দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ভস্মীভূত হইয়া কাঠকয়লায় পরিণত হইয়া গেল!

সিন্ধবাদ বলিতে লাগিল—বন্ধুগণ, আশ্চর্য্য সে দেশের লোকের ব্যবসা বুদ্ধি। সেই কাঠকয়লা তখনি স্বর্ণকারেরা সেরদরে কিনিয়া লইয়া চলিয়া গেল। বিধাতার কি ন্যায়পরতা! যে লোকটা বাঁচিয়া থাকিতে যথেষ্ট স্বর্ণসঞ্চয় করিতে পারে নাই—তাহারই অঙ্গারীভূত দেহাবশেষ এখন রাশি রাশি স্বর্ণগলিত করিবার কাজে লাগিবে। বিধাতার এমন বিচার আছে বলিয়াই এখনো পৃথিবীতে এত অন্যায়, অত্যাচার সত্ত্বেও লোকে জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গেলে দলের একজন আমাকে বলিল—তুমি বিদেশী এখানে কোথায় থাকিবে? বরঞ্চ আমার সঙ্গে চলো, সেখানে আশ্রয় পাইবে, আর কৌতুহল যদি থাকেতো আমাদের দেশের রীতিনীতি ও জানিতে পারিবে।

আমি হাতে যেন আকাশের চাঁদ পাইলাম। লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার সঙ্গে তাহাব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

সেখানে লোকটি আমাকে বিশেষ আদর যত্ন করিল, নূতন পরিধেয় দিল, আহার্য্যে পরিতৃপ্ত করিল এবং প্রচুর বিশ্রাম করিয়া শরীর ও মনের প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইলাম।

আমি লক্ষ্য করিলাম যে সকলেই সেই লোকটিকে বড়-দালালী বলিয়া ডাকিতেছে। আমিও তাহাকে বড়-দালালী বলিয়া সম্বোধন করিয়া ডাকিতে লাগিলাম।

২

পরদিন দ্বিপ্রহরে আহার ও বিশ্রামের পরে বড়-দালানীর কাছে গিয়া বলিলাম—মহাশয়, এবারে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন, লোকটাকে আপনারা পোড়াইয়া মারিলেন কেন? বড়-দালানী বলিল—আপনাকে গতকাল বলিয়াছি যে লোকটার চাকরি গিয়াছিল বলিয়াই সে পুড়িয়া মরিল। কেবল সে নয়, এদেশের যাহার চাকরি যায়- সে-ই পুড়িয়া মরে, ইহাই এদেশের শাস্ত্রের অনুশাসন।

আমি অবোধ তখনো চাকরীর মহিমা ও তত্ত্ব জানিতাম না তাই প্রশ্ন করিলাম—মহাশয় চাকরি কি?

বড-দালানী বলিল—আপনার প্রশ্ন অতিশয় জটিল, ব্যাপারটী অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, অনাদিকাল হইতে সনাতন মুনিঋষিগণ ইহার তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এ বিষয়ে হাজার গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কাজেই আমার মত সামান্য লোক তাহা বুঝাইতে অক্ষম। তবে সংক্ষেপে বলিতে পারি আমাদের ধর্মের নামান্তর চাকরি। আব এই দেশের নাম চাকরিস্তান।

এই বলিয়া সে বিরাট একখানা মানচিত্র আমার সম্মুখে খুলিয়া ফেলিয়া বলিল—এই যে বিরাট প্রাকৃতিক ত্রিভুজ দেখিতেছেন—ইহাই আমাদের দেশ। পশ্চিমদিকের ওই অংশটার নাম কাঁচিস্থান, মাঝখানে ওই হিন্দুস্থান আর পুবদিকের এই অংশটার নাম চাকরিস্থান।

আমি শুধাইলাম—আর ওই যে অংশটা অনশন ক্লিষ্টের চিবুকের মত সূচ্যগ্র হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—উহার নাম কি?

বড়-দালানী বলিল—ওই অংশটার নাম কেরাণীস্থান।

বড়-দালানী বলিয়া চলিল, আপনি যখন চাকরীস্থানে আসিয়া

পড়িয়াছেন তখন আপনাকেও শীঘ্র একটি চাকরী সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে, নতুবা আপনারও সমুদ্রতীরের লোকটির দশা হইবে।

আমি বলিলাম চাকরী করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তো আমার নাই।

সে বলিল—চাকরীতে বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন নাই ইহা অনেকটা ভগবৎসাধনার মত, বিদ্যাবুদ্ধিতে কিছু হয় না—নিষ্ঠাই আসল।

তখন আমি বলিলাম—এমন কি চাকরী আছে, যাহা বিদ্যাবুদ্ধি ছাড়াও করা যায়?

বড়-দালালী বলিল—সব চাকরীই করা যায়, বিশেষভাবে এমন কয়েকটি আছে যাহাতে বিদ্যা বুদ্ধি থাকিলেই অসুবিধা হয়।

আমি জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া থাকিলাম।

সে বলিয়া চলিল—পাঠ্যপুস্তক রচনা, পত্রিকার সম্পাদনা ও পাঠশালার শিক্ষকতার মধ্যে কোনটি আপনি গ্রহণ করিতে পারেন।

আমি অল্প বয়সে একসময়ে আমি মেষপালক ছিলাম কাজেই পাঠশালার শিক্ষকতা সম্বন্ধে তখন হয় তো কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাই বলিলাম, তবে আমাকে একটি শিক্ষকতা সংগ্রহ করিয়া দিন।

বড-দালালী আমার অভিপ্রায় শুনিয়া খুসী হইলেন। বলিলেন—আপনার সঙ্কল্প সাধু—কারণ শিক্ষকতার মত এমন পবিত্র ব্যবসায় আর নাই। স্বর্গের অমৃতের স্বাদ মর্ত্তলোকে দিবার ভার আপনার হাতে থাকিবে, আপনি জাতিগঠন করিয়া তুলিবেন, দেশের ভবিষ্যৎ আপনার হাতে, লোকে আপনাকে শ্রদ্ধা করিবে! ভদ্রলোকের বাড়ীতে গেলে শিক্ষক শুনিয়া তাহারা বসিবার জন্ত আপনাকে মোড়া অগ্রসর করিয়া দিবে, কিন্তু সাবধান আপনার দোকানদারের নিকটে কখনো যেন প্রকাশ করিবেন না আপনি শিক্ষক।

—কেন মহাশয়?

—এমন অমূল্যরত্ন যাহারা দান করে লোকে প্রায়ই তাহাদিগকে মূল্য দিতে ভুলিয়া যায়। বেতন আপনি পাইবেন—খাতাপত্র হইতে গলিয়া কতটুকু এবং কবে আপনার হাতে আসিয়া পৌঁছিবে তাহা অনিশ্চিত।

আতঙ্কিত হইয়া সুধাইলাম—সে কি?

—ভীত হইবেন না। জীবিত থাকিতে যদি না পান—তবু জানিবেন আপনার শ্রাদ্ধের সময় নিশ্চয় পাইবেন।

তবু খানিকটা আশ্বস্ত হইলাম।

বড়-দালালী বলিল—আপনাকে একটি উচ্চ-পাঠশালার চাকরী সংগ্রহ করিয়া দিব—সেখানে মাসান্তে না হোক বৎসরান্তে বেতন নিশ্চিত পাইবেন।

৩

এখন আমি একটি উচ্চ-পাঠশালার অধ্যাপক। ।দেখিলাম ইহাতে যাহা কিছু উচ্চতা তাহা ওই নামেই। আমার বিদ্যাবুদ্ধির কথা কোন তরফ হইতেই উঠিল না। কোন তরফ এইজন্যে বলিলাম যে—পাঠশালার শিক্ষকদের দুইদল কর্ত্তা, একদল কর্ত্তৃপক্ষ, অপর দল—ছাত্রগণ, ইহাদের মধ্যে কোন্ দল বেশী প্রবল বলিতে পারি না, বোধকরি শেষোক্ত দলই কিছু বেশী—কারণ তাহাদের মাহিনা দিবার কথা, মাহিনা দেয় এমন মিথ্যা বলিতে পারি না, [পাঠশালা সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে কেহ আমাদের ক্ষমা করে না, অন্যত্র যাহা খুসী হোক্, তাহাতে আসে যায় না], ছাত্রেরা কাগজপত্রে বেতন দেয়, কর্ত্তৃপক্ষ আবার আমাদের কাগজপত্রে বেতন দেন, আমাদের কি

করিয়া চলে ? কেহ দর্জ্জিগিরি করে, কেহ বাজার-সরকারী করে, কেহ পথ ঝাড়ু দেয়, আবার কেহ কেহ বা ক্ষেত-খামারের কাজ করে—গোরু তাড়ানো ভালই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। এইভাবে দেশের ছেলেদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতেছে, বর্ত্তমানের কাদায় ডোবা, রথচক্র সবলে ঠেলিয়া লইয়া অদূরবর্ত্তী স্বর্গের দিকেই নাকি আমরা চলিয়াছি, লোকে ধন্য ধন্য করিতেছে, সরকার আমাদের কাজে গৌরব অনুভব করিতেছে, ছাত্ররা বলে স্যর খুব ভালো মানুষ [পার্সেন্টেজ কাটেন না], কর্ত্তৃপক্ষ বলে—লোকটি খুব বিনয়ী [বেতন চাহেন না], আমরা দুই ক্লাসের ফাঁকে অধ্যাপকদের কক্ষে বসিয়া পরস্পরের ছিন্নবস্ত্র সেলাই করিয়া দিই এবং গত বৎসরের শূন্য নস্যকৌটাব মধ্যে আঙুল চালাইয়া দিয়া সবলে নস্যগ্রহণ করি। বড-দালানীব সাবধান বাণী ভুলি নাই—দোকানীর কাছে কখনো বলি নাই যে আমি শিক্ষকতারূপ পবিত্র ব্যবসায়ে নিযুক্ত'

মাঝে মাঝে জানলা দিয়া তাকাইয়া দেখিতে থাকি দশটার সময়ে অজস্র জনতা চাকরী মন্দিরের দিকে ছুটিয়াছে, কেহ ট্রামে, কেহ বাসে, কেহ রিক্সায়, কেহ কেহ বা মোটরকারে, ওই লোকটা হাঁটিয়া চলিয়াছ কেন ? ও কি অধ্যাপক নাকি ? তাহাদের মুখে চোখে তীর্থযাত্রীর ব্যগ্রতা। আবার দেখিলাম বেলা পাঁচটায় সকলে বাড়ী ফিরিতেছে—মুখে পরিতৃপ্তি, হাতে একজোড়া কপি, দেহে অবসাদ, পায়ে—না পায়ে তো জুতা নাই। তবে ও নিশ্চয় কোন এক উচ্চপাঠশালার অধ্যাপক।

এই রকম দেখিতে দেখিতে শূন্য-উদরে পাকস্থলী যখন তীব্র মোচড়ে খাদ্যাগ্রহ করিয়া উঠিত চাকরকে বলিতাম—এক গেলাস জল দে। শুনিয়াছিলাম সহরের জলে অনেক সময়ে টাইফয়েডের বীজাণু থাকে, সেই ভরসায় অনেকবার জল পান করিতাম। [কিন্তু পাছে আমরা অকালে দেশকে ফাঁকি দিই সেই আশঙ্কায় কর্ত্তৃপক্ষ টিউবওয়েলের বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।] আর বীজাণু থাকিলেই বা কি ? যে

জঠরে এম, এ পাশের বিদ্যা, প্রাত্যহিকী ক্ষুধা নিয়ত পরিপাক হ য়া যাইতেছে, সেখানে মৃত বীজাণু কি করিবে ?

কক্ষের অপর প্রান্ত হইতে দর্শনের অধ্যাপকের স্বর কানে আসিল— সক্রেটিস্

এম, এ পড়িবার সময়ে সক্রেটিস নামে একটা লোকের নাম শুনিয়াছিলাম। লোকটা 'হেমলক' পান করিয়া মরিয়াছিল কেন ? লোকটা কি অধ্যাপক ছিল নাকি ? আহা 'হেমলকের' ভরি কত ? নিজের অগোচরে হাতখানা পকেটের মধ্যে গেল—ছিন্ন তলদেশ কোন বাধা দিল না। একি অধ্যাপকের পকেট কাটিল কে ? তবে অধ্যাপকের চেয়েও অসহায় কেহ আছে নাকি ? বোধ করি ইনস্যুর কোম্পানীর এজেন্ট ! মরি, মরি, বিধাতার কি আশ্চর্য্য বিধান। 'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র, এ দেশ !'

আজ মাসের পয়লা। দেখিতে পাইতাম পথে স্ফীতবক্ষ [যাহা ভাবিতেছে পাঠক, তাহা নয়] জনতা বুকপকেটে নোটের তাড়া গুঁজিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। আমরাও কম কিসে ? শূন্য মধুভাণ্ডের চতুর্দ্দিকে মধুমক্ষিকার মত অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের চারদিকে বার কয়েক ঘুরিয়া হাতের খবরের কাগজখানা কয়েক ভাঁজ করিয়া বুক পকেটে রাখিয়া বুক দুলাইয়া বাড়ী চলিলাম। পথে অন্য এক উচ্চ পাঠশালার অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা—বেচারার মুখ শুষ্ক। সে বলিল— ইস্ বুকপকেট যে ফেটে যাবে—এক তাড়া নোট—আপনাদের ভাগ্য ভাল। ঈর্ষ্যায় বেচারার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

আমি অনুকম্পামিশ্রিত হাস্যে বলিলাম—হেঁ হেঁ। আপনাদের বুঝি—

সে বলিল সাবধানে যাবেন—কেউ তুলে নিতে পারে।

আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলাম—Who steals my purse steals trash !

ধন্য ধন্য সেক্সপীয়ার। শুনিয়াছি তুমি Grammar School-এর মাষ্টার ছিলে—সেখানেও কি এই ব্যবস্থা ছিল নাকি ?

সঙ্গে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন, বলিলাম—চলুন এই পথে যাই সোজা হবে।

তিনি বলিলেন—না, না, ওখানে নয়।

—কেন ?

—ওখানে একটা মুচি বসে তার ভয়ে ?

শুধাইলাম—সে আবার কি ?

তখন তিনি নিজের জুতা জোড়াটা দেখাইয়া বলিলেন—দেখুন না, তালি দিতে দিতে এর মৌলিক চামড়ার আর কোন চিহ্ন নাই। একদিন সারাইয়া দিবার জন্য তাহাকে বলাতে সে বলিল—ও জুতা সারাইবার বিদ্যা তাহার নাই। তাহার গুরুজি ছাপরা জিলায় আছে—সে পারে। এখন মুচিটা আমাকে দেখিলেই হাসে। তারপরে বলিলেন—চলুন ওই পথে যাই।

আমি বলিলাম—ও পথে মুদিটা আছে। ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন ছিল না। তখন দুইজনে ব্ল্যাকআউটের অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। অন্ধকার ঘনীভূত হইলে গবর্ণমেন্টের সামরিক ব্যবস্থাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে দুইজনে নির্ভয়ে প্রস্থান করিলাম।

৪

এমনিভাবে দিন চলিতেছিল—এমন সময়ে একদিন খবর আসিল হনলুলু দ্বীপে ভূমিকম্প হইয়াছে—তাহার তরঙ্গ নাকি চাকরীস্তানের রাজধানীতেও আসিয়া পৌঁছিবার আশঙ্কা আছে।

তখন সে কি ছুটাছুটি! ছেলে বুড়া, জোয়ান মুমূর্ষু, তরুণ তরল, স্ত্রী কন্যা, মেসো পিসি, খুড়ো খোঁড়া, কালা পিতা, বোবা রোগা, কালা ধলা—যে যেদিকে পারিল ছুটিল। পাওনাদার পাওনা ছাড়িয়া ছুটিল, স্ত্রীলোক গয়না ফেলিয়া ছুটিল, গোয়ালা গাভী ফেলিয়া ছুটিল, ড্রাইভার পেট্রোল ছাড়িয়া ছুটিল, ডাক্তার রুগী ফেলিয়া ছুটিল, কবিরাজ হামান দিস্তা ছাড়িয়া ছুটিল, স্বামী পরস্ত্রী লইয়া ছুটিল! কুলীরা যাত্রীর মাল লইয়া নিজের বাসার দিকে ছুটিল। তিনদিনের মধ্যে রাজধানী জনশূন্য।

কেবল আমরা অত্যুচ্চ হইতে নিম্নতম পাঠশালার শিক্ষকেরা শিবরাত্রির সলিতার মত সহরে রহিয়া গেলাম। আশা ছিল ছাত্ররা ফিরিয়া আসিবে, আশা ছিল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করিবেন, আশা ছিল গভর্ণমেণ্ট 'কনসিডার' করিবেন, আশা ছিল হনলুলুর তরঙ্গ আসিয়া পৌঁছিয়া সকল সমস্যার শান্তি করিয়া দিবে। কিন্তু কেহই আসিল না। হায়, শিক্ষকদের সময় মত মরিবার আশাও সফল হয় না।

আমরা যে বাড়ী গিয়া বসিয়া থাকিব তার উপায় নাই—পাঠশালার ক্ষুধিত পাষাণে আমাদের গ্রাস করিয়াছে। এখন আমরা চাদর ও আশা গৃহে ফেলিয়া রাখিয়া নিষ্কামভাবে পাঠশালায় আসি, শূন্য কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াই; শূন্য কক্ষের ছাদে কয়েকটি চামচিকা ও মেঝেতে কয়েকজন শিক্ষক—মাঝখানের শূন্য বেঞ্চিগুলিতে বসিয়া যাহারা ক্লাসের

সময়ে গল্প করিত—এখন তাহারা হয়তো নেত্রকোণায় আমবাগানে হা ডু-ডু খেলিতেছে।

এমনিভাবে দিন যায়, ক্রমে মাসের পয়লা তারিখও আসে। আমার মুদির মুখমণ্ডল ক্রমশঃ মারোয়াড়ের মৃত্তিকার বন্ধুরতাকেও ছাড়াইয়া যায়, রাষ্ট্রভাষা না শিখিয়া ভালই করিয়াছি, সে যাহা বলে তাহার সবটা বুঝিতে পারি না—সবটা বুঝিবার দরকারও হয় না। গোয়ালা পঞ্চগব্যের মধ্যে নিকৃষ্টটার ব্যবস্থা করিবে বলিয়া শাসায়। ধোপানী মেয়েটা এইবার লইয়া নিরানব্বইবার আসিল। সে সাত ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া রাগে ঘামিয়া নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি গরগর করিয়া প্রস্থান করিল। আমি বসিয়া বসিয়া দেশের অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও আমার লোভনীয় অবস্থার কথা ভাবিতে থাকি।

এমন সময়ে একদিন কি করিয়া পাড়ায় প্রকাশ হইয়া পড়িল আমি উচ্চ পাঠশালার অধ্যাপক। সংবাদটি মন্ত্রের মত কাজ করিল। মুদি বাকীতে জিনিষ দেওয়া বন্ধ করিল, গোয়ালা যাহা দিয়া গেল তাহা দুগ্ধ নয়, বন্ধুরা কথা বলা ছাড়িয়া দিল; বাড়ীওয়ালা নোটিশ দিল, চাকর ঘরের তালা ভাঙিয়া সরিয়া পড়িল, রাস্তার ধারে একদল ছেলে একটা কুকুরকে ঢিল মারিবার উদ্যোগ করিতেছিল—কুকুটা দন্তভঙ্গী করিতেই তাহারা ভয় পাইল, এমন সময়ে আমাকে দেখিয়া তাহারা বলিল—ওই একটা মাষ্টার যায়—ওকে মার্। আমার দন্তভঙ্গী করিবার উপায় নাই —বাঁধানো দাঁত, ভাঙিয়া গেলে আর গড়িতে পারিব না, তাই ঢিল হজম করতঃ অবিবেচক বালকদের ক্ষমা করিয়া সরিয়া পড়িলাম, পাড়ায় আমি একঘরে হইলাম।

কয়েকদিন পরে রাজধানীর শিক্ষকদের নিখিল-চাকরীস্থান-উচ্চ পাঠশালা সমিতির অধিবেশন হইল। সেখানে স্থির হইল—শিক্ষকদের চাকরী যখন গিয়াছে তখন দেশের নিয়ম অনুসারে শীঘ্রই পুড়িয়া মরিতে

হইবে। তাহার চেয়ে শিক্ষকেরা ঘোড়ার মাঠে যৌথভাবে যদি গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে, তবে দেশে একটা নৈতিক আলোড়ন উপস্থিত হইতে পারে এবং ভবিষ্যতের শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। দশ হাজার শিক্ষক ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় ঘোড়ার মাঠে গলায় দড়ি দিয়া মরা স্থির করিল।

ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানকে নষ্ট করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না, কাজেই শিক্ষকদের দলত্যাগ করিয়া সব্যসাচীর মত দাড়ি গোঁফ লাগাইয়া আত্মগোপন করিলাম।

৫

শিক্ষকদের আত্মত্যাগ দেখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘোড়ার মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে কি জনতা! এতদিন তাহারা সিনেমাতে মৃত্যু দেখিয়াছে, আজ সশরীরে মৃত্যু দেখিবার লোভে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত। মাঝে পরিষ্কার জায়গায় সারি সারি লোহার দণ্ড, লোহার দণ্ডে দড়ি ঝোলানো; এমন দশ হাজার, দশ হাজার শিক্ষক তাহাতে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে। ব্যবস্থার ত্রুটি নাই, স্বয়ং পৌরসভা ও গভর্ণমেন্ট নাকি সহৃদয় হইয়া ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে শিক্ষকের দল আসিয়া হাজির হইল; ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল, হাততালি পড়িল; শিক্ষকদের মুখে স্বর্গীয়ভাব—অস্থিদানের পূর্ব্বে দধীচির মুখে অনেকটা এই রকম জ্যোতি দেখা গিয়াছিল।

পরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল, দশ হাজার শিক্ষক গলায় দড়ি পরিয়া 'বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে' বলিয়া ঝুলিয়া পড়িল, যেন দশ হাজার কলার কাঁদি বাতাসে দুলিতে লাগিল। ওঃ জনতার মধ্যে সে কি উৎসাহ, সে কি

আনন্দ, সে কি জয়ধ্বনি ! ভীড়ের মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—বাঃ স্যার বেশ গিয়েছেন, এক্সেলেন্ট !

বাংলার অধ্যাপক নিতান্ত কৃশ ও লঘুকায় ; ঝুলিয়া পড়িয়াও মরিতেছিল না ; দয়াপরবশ হইয়া দু'জন লোক [বোধ করি ভূতপূর্ব্ব ছাত্র] আসিয়া তাহার পা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল—বাংলার অধ্যাপক সাধনোচিত স্থানে প্রস্থান করিল ।

ইংরাজীর সাড়ে তিনমনি অধ্যাপক ঝুলিতে উদ্যত এমন সময়ে উৎসাহী একজন ছাত্র ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—স্যার—একটা suggestion দিয়ে যান , মিল্টনের Lycidas কবিতার central idea কি ?

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাড়ে তিনমনি ঝুলিয়া পড়িতে পড়িতে অর্দ্ধোক্ত স্বরে বলিয়া ফেলিল—'এথ্' ।

উৎসাহী ছাত্র বলিল—বুঝেছি স্যার—'ডেথ' ।

দশ হাজার শিক্ষক মরিল । কে বলিল সভ্যতার অগ্রগতি হয় নাই । সেকালের একটা দধীচিকে লইয়া কত গৌরব—আর একালে দশ দশ হাজার দধীচি !

কিন্তু ইহার পরে যাহা ঘটিল তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না । একদল লোক ছুরি লইয়া ছুটিয়া গিয়া শিক্ষকদের গলা হইতে দড়ি কাটিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিল । আমি পাশের একজনকে শুধাইলাম—ব্যাপার কি ?

সে বলিল—উহারা নিখিল-চাকরীস্তান-মুমূর্ষু-রজ্জু-সংগ্রহ কোম্পানীর এজেন্ট । এই দড়িগুলি সংগ্রহ করিয়া চড়া দামে বিক্রয় করিবে । ভাবিয়া দেখুন কত লাভ ? প্রত্যেকের গলায় যদি দশ হাত দড়ি থাকে—তবে দশ হাজারে লক্ষ হাত । দড়ির বাজার যা চড়া ! কোম্পানী বিনা মূলধনে বেশ দু' পয়সা কামাইবে ।

কে বলিল চাকরীস্তানের লোকের ব্যবসা বুদ্ধি নাই !

আমি সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দাহ করিবার জন্য চলিয়া হইয়াছে। আমি প্রাণভয়ে সমুদ্রতীরের দিকে রওনা হইলাম, যদি কোন বিদেশী জাহাজ দেখি তো এ দেশ হইতে সরিয়া পড়িব। সমুদ্রের তীরে গিয়া দেখি একখানি জাহাজ রহিয়াছে। নিকটে গিয়া দেখি সেখানি আমারই দ্বিতীয় জাহাজখানি। তাহার নাবিকেরা বলিল—ঝড়ের মুখে পড়িয়া তাহারা যবদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হয়। আমার আশা তাহারা ছাড়িয়াই দিয়াছিল—এখন আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। আমি জাহাজে উঠিয়া কয়েকমাস সমুদ্রযাত্রার পরে বসোরায় ফিরিয়া আসিলাম।

সিন্ধবাদ তাহার কাহিনী শেষ করিয়া সমাগত অতিথিদিগকে অনেক ধনরত্ন দান করিয়া সেদিনের মত বিদায় দিল, যাইবার সময়ে বলিল—আগামীবার তাহার দশমবার সমুদ্র ভ্রমণের কাহিনী বলিতে চেষ্টা করিবে।

প্রফেসর রামমূর্ত্তি

অবশেষে চাকুরিটি গেল।

তারপর কি হইল? ইহাই কি যথেষ্ট নয়? বাঙ্গালীর জীবনে ইহার চেয়ে মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডি আর কি হইতে পারে?

কিন্তু আপনাদিগকে একেবারে হতাশ করিব না—তারপরেও কিছু ঘটিল। কিন্তু তার আগের কথা প্রথমে বলিয়া লই।

রামনাথবাবু প্রাইভেট কলেজের অধ্যাপক। 'প্রাইভেট কলেজ' কথাটা নিতান্ত স্বতোবিরুদ্ধ—ওরকম পাবলিক জিনিষ আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। কলেজের ঝাড়ুদার হইতে উচ্চতম ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই

ইহার কর্ত্তৃপক্ষ; এমন কি মাঝে মাঝে পথের পথিক ও ফিরিওয়ালা পর্য্যন্ত ঢুকিয়া শাসাইয়া যায়।

এহেন প্রাইভেট কলেজে রামনাথবাবু অধ্যাপক। আমার অনেক অধ্যাপক বন্ধু আছেন, তাঁহাদের খাতিরে রামনাথবাবুর বেতন কত সে কথাটা চাপিয়া গেলাম, বেতন যাই হোক, নামের আগে ইঁহারা অধ্যাপক ও প্রফেসার শব্দদ্বয় যোগ করিতে পারেন, ওই শব্দ দুটার এমনি মোহ যে, কৌশলে ব্যবহার করিতে পারিলে অর্থের মোহের প্রতিষেধকের কাজ করে, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ইহা সবিশেষ অবগত আছেন। লোকনিয়োগ করিবার সময়ে তাঁহারা হাসিয়া বলেন—এখন থেকে তো আপনি অধ্যাপক—মানে 'স্যালারি' যাই হোক্ না—

উভয়পক্ষ হাসিয়া ওঠেন—হেঁ, হেঁ, হেঁ……

এহেন অধ্যাপক রামনাথবাবু—চাদর কাঁধে ফেলিয়া প্রত্যহ কলেজে যান। অধ্যাপকের দল সর্ব্বদা একখানা চাদর কেন সঙ্গে রাখেন, এ বিষয়ে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি, অবশেষে তাঁহাদের জীবনযাত্রা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে কোন মুহূর্ত্তে ইঁহাদিগকে নিকটতম ল্যাম্প পোষ্টের সঙ্গে ঝুলিয়া পড়িতে হইতে পারে—তখন পাছে সরঞ্জামের অভাবে পড়িতে হয়—তাই এই ব্যবস্থা!

অধ্যাপকদের মধ্যে।বলাবলি হয়—আমাদের মাইনে কম, কিন্তু ছুটি অনেক—

একজন বলে—তার মানে কি জানেন? কর্ত্তৃপক্ষ জানে টাকা বেশি দিতে পারবো না, তাই সময় প্রচুর দিয়েছে যাতে ওই সময়ে আমরা কিছু কিছু ব্যবসা করতে পারি—

দর্শনের অধ্যাপক রসুনের ব্যবসা করিতে গিয়া ফেল পড়িয়াছেন, তিনি বলেন—ব্যবসা সকলের জন্য নয় হে! ব্যবসা আর বেদান্ত—ও দুটো বড় কঠিন জিনিষ।

এমন সময়ে রামনাথবাবু ঘরে ঢোকেন।

সকলে বলেন—রামনাথবাবু আপনার মত কি? তিনি ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলেন—ঘণ্টা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে ক্লাস আছে। রেজেষ্ট্রি লইয়া রামনাথবাবু ক্লাসের দিকে যান্।

সকলে এমনভাবে ঘড়ির দিকে তাকান, যেন ঘড়িটা এইমাত্র দেখিলেন। মনে মনে রামনাথবাবুর উপরে বিরক্ত হইয়া সকলে উঠিয়া পড়েন—

একজন অস্ফুট স্বরে বলেন—এত শীগ্‌গীর ক্লসে গেলে ছেলেরা ডিমরালাইজড্ হয়ে পড়বে যে! ব্যবসা ও বেদান্ত বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে ভূতপূর্ব্ব রসুনের ব্যবসায়ী, সম্প্রতি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এক ক্লাসে যাইতে আর এক ক্লাসে, আর এক ক্লাসে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের ক্লাসে গিয়া যখন উপস্থিত হন—তখন কেবল রেজিষ্ট্রিমাত্র করিবার সময় থাকে।

ব্যবসা ও বেদান্ত দুই-ই অতি কঠিন।

এ হেন কর্ত্তব্যপরায়ণ রামনাথবাবুর চাকুরি গেল। যাওয়া উচিত হয় নাই তাহা জানি, কিন্তু উচিতমত কয়টা কাজ এ সংসারে হইয়া থাকে!

রামনাথ বাবুর দোষ কি? আমি তো কিছু দেখি না, কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিচারে চাকুরির সেরা দোষ তিনি করিয়া বসিয়াছেন। রামমাথবাবু বেতনবৃদ্ধির জন্ত দরখাস্ত করিয়াছিলেন!

কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন—দেখি কি করা যায়!

সহকর্ম্মীরা একবাক্যে বলিলেন—আস্পর্দ্ধা দেখ। তখন সকলে বিশ বছর পরে, আবিষ্কার করিয়া ফেলিল রামনাথবাবু অধ্যাপনার একান্ত অযোগ্য!

কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন—উনি ক্লাস ম্যানেজ করতে পারেন না—

মেজো কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন—ওঁর গলার স্বর যথেষ্ট উঁচু নয়—

সেক্ষো কর্তৃপক্ষ বলিলেন—ওঁর উচ্চারণ নেহাৎ সেকেলে—

সহকর্ম্মীরা বলিলেন—সহকর্ম্মী না হ'লে ওঁর সমস্ত দোষ খুলে বল্‌তাম—

ভূতপূর্ব্ব রমুন ব্যবসায়ী, সম্প্রতি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নাকের দোনালা বন্দুকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নস্তের বারুদ পুরিতে পুরিতে বলিলেন —ওর বাড়ীর ঝি'র সঙ্গে আমার আলাপ আছে কিনা—তোমরা জেনে রেখো—আর বেশি দিন নয়—

সকলে জিজ্ঞাসা করল—ব্যাপার কি ?

তিনি বলিলেন—এত সহজ নয়—

ব্যবসা ও বেদান্ত দুই-ই দুরূহ।

এইরূপে সকলের, কর্তৃপক্ষ হইতে ঝাড়ুদারের ঐক্যতানের ফলে রামনাথ বাবুর চাকুরিটি গেল !

২

রামনাথবাবু মনের দুঃখে বনে গেলেন। এত স্থান থাকিতে বনে গেলেন কেন ? কারণ প্রাইভেট কলেজগুলি সংসারের সীমান্তে স্থাপিত—তার পরেই বনের আরম্ভ। এই কলেজগুলিকে আধ্যাত্মিক শ্মশান বলিলেই চলে—এখানে আসিলে সবাই সমান। ছোট বড়, ভালমন্দ, ধনী নির্ধন, ছাত্র অধ্যাপক কোন ভেদ এখানে নাই, আর অনির্ব্বাণ যে চিতাগ্নি এখানে জ্বলিতেছে তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে সরস্বতী নিরন্তর সহমরণে পুড়িতেছে।

আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমি অধ্যাপকদের নিন্দা করিতে বসি নাই। এই আধ্যাত্মিক শ্মশানে মুর্দাফরাসের কাজ করিতে করিতে

অধ্যাপকেরা প্রত্যেকে এক একজন হরিশ্চন্দ্র হইয়া উঠিয়াছেন—তাঁহাদের গুণবর্ণনার জন্যই কলম ধরিয়াছি। লোকের বিশ্বাস অধ্যাপকেরা ভাল মানুষ, অর্থাৎ আত্মরক্ষায় অক্ষম, সত্যভীরু অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন ছাড়া মিথ্যা কথা বলেন না; বদান্য অর্থাৎ জিনিষ কিনিয়া নগদ দাম দেন; নিরীহ অর্থাৎ ছাত্রদের পার্সেন্টেজ ছাড়া আর কিছু কাটেন না, পক্ষপাত-হীন অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ বিবাহ না করিয়া ক্ষান্ত হ'ন না, উচ্চাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ দোতালা বাড়ীকে তেতালায় পরিণত করিবার ইচ্ছা আছে, পণ্ডিত অর্থাৎ বোধোদয় ও কার্ষ্ট বুক নিশ্চয় পড়িয়াছেন।

কিন্তু কেহ কি জানে অধ্যাপনা করিতে করিতে ইঁহারা কি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছেন? হাজার হাজার ছাত্রকে পড়াইতে গিয়া যে বীরত্ব, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, রণকৌশল, বাগ্মিতা, কূটনীতি, সাহস, দুঃসাহস, প্রতিভা ইঁহারা প্রত্যহ দেখান তাহার ফলে অচিরকালের মধ্যে প্রত্যেকে যে যৌগিক ক্ষমতালাভ করেন সংসারে তাহা যেমন দুর্লভ, তেমনি বিস্ময়কর।

এই গুপ্ত তথ্য কেহই জানে না, রামনাথ বাবুও জানিতেন না। তিনি যখন বনে গেলেন ভাবিয়াছিলেন তাঁহার জীবন শেষ হইল—কেবল বিধাতাপুরুষ জানিতেন এবারে নূতন জীবন আরম্ভ হইল।

বনের মধ্যে দিয়া চলিতে চলিতে তিনি দেখিলেন অদূরে একটি ভীষণ-দর্শন ব্যাঘ্র বসিয়া আছে—একেবারে রয়াল বেঙ্গল টাইগার। রামনাথবাবু বিচলিত হইলেন—বাঘ শিকারের আশায় লেজ আছড়াইতে লাগিল; রামনাথবাবু থামিলেন, বাঘ লাফ দিবার জন্য দেহ সঙ্কুচিত করিল; বাঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শূন্যে লাফ দিল—আর ভীত-ত্রস্ত-ব্যাকুল-মুমূর্ষু রামনাথবাবু মুখ দিয়া অজ্ঞাতসারে লক্ষবার উচ্চারিত অধ্যাপকদের ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ ছাত্রদের আতঙ্কস্বরূপ সেই বাক্য বাহির হইয়া পড়িল—হোয়াটস্ ইওর রোল?

রামনাথবাবু তারপরে কি হইল আর কিছু জানেন না—যখন মূর্চ্ছা ভাঙিল তখন দেখিলেন, তিনি শায়িত আর সেই ভীষণ বাঘটা তাঁহার পায়ের তলায় নিরীহ বিড়ালের মত পড়িয়া আছে!

ব্যাপার কি? এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? বাঘটাকে দেখিয়া তিনি যত ভীত হইলেন, বাঘটা তাঁহাকে দেখিয়া তার চেয়ে বেশী ভীত হইল! আশ্চর্য্য ব্যাপার! তখন তাঁহার মনে হইল এতকাল অধ্যাপনা করিতে গিয়া নিশ্চয় কোন আধ্যাত্মিক শক্তি তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন—যাহার ফলে বাঘ তাঁহার বশ হইয়াছে! না হইবেই বা কেন? বাংলা-দেশের বাঘের চেয়ে সাহসী ছাত্রগণ যাঁহার বশীভূত, বাঘ তাঁহার কাছে কোন্ ছার!

তখন রামনাথবাবু বাঘটার গলায় চাদর বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

ইহার পরে গল্প সংক্ষিপ্ত।

ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রামনাথ চক্রবর্ত্তী এখন বিখ্যাত প্রোফেসার রামমূর্ত্তি। তিনি সার্কাস পার্টি খুলিয়াছেন। সার্কাসের অন্যান্য খেলা শেষ হইলে তিনি একাকী নিরস্ত্র বন্য বাঘের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করেন, দুর্দ্দান্ত বাঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শূন্যে লাফ দেয়, তিনি দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী তুলিয়া জিজ্ঞাসা করেন—'হোয়াটস্ ইওর রোল'? অমনি সেই উদ্যত বাঘটা মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া ধপ্ করিয়া পড়িয়া যায়। ভীত দর্শকের দল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া উল্লাসে হাততালি দিয়া ওঠে।

কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে 'পাশ' চাহিয়া পাঠান, রামনাথবাবু 'মহৎ প্রতিহিংসার' অনুপ্রাণিত হইয়া 'পাশ' পাঠাইয়া দেন। ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মীরা আসিলে প্রথমশ্রেণীর আসনে বসিতে পায়, রসুন-দর্শন-বিজয়ী সেই অধ্যাপক এই ব্যবসায়ে ঢুকিবার জন্য আবেদন করিয়া ছিলেন; রামনাথবাবু বলিয়াছেন—ব্যবসা ও বেদান্ত দুই-ই বড় দুরূহ!

প্রোফেসার রামমূর্ত্তি আজ ধনে, মানে, প্রতিপত্তিতে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মীরা অবসর সময়ে অর্থাৎ ক্লাসের ঘণ্টা পড়িলে তাঁহার বিষয়ে আলোচনা করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করেন!

কেবল দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক এই আলোচনায় যোগ দেন না, তিনি তখন নিজের নাকের দোনলা বন্দুকে পরের নস্তের বারুদ নীরবে বসিয়া পুরিতে থাকেন।

আধ্যাত্মিক ধোপা

পলাশপুরের যদুবাবুর ছোট ছেলেটি এবারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে। বন্ধুরা যদুবাবুকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন ছেলেকে পড়াও।

যদুবাবু দেয়ালে পতঙ্গের পশ্চাতে ধাবমান টিকটিকির লেজটির প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—টাকা কোথায়?

বন্ধুরা বলিলেন—টাকা? সেজন্য ভাবলে চলবে না, জোতব্রহ্মত্র বেচে পড়াও, ঘটিবাটি বাঁধা রেখে পড়াও, সুদেআসলে উঠে আসবে, এ তো একেবারে 'শিওর উইন'।

উপদেশ দিয়া এবং টাকা পয়সার উপায় না দিয়া বন্ধুরা প্রস্থান করিল। যদুবাবু বাড়ীর ঘটিবাটির মানসাঙ্ক কষিতে লাগিলেন। টিক-টিকিটা মাছিটাকে ধরিয়া প্রায় গ্রাস করিয়াছে।

বিকালবেলা যদুবাবুর নামে এক গোছা চিঠি আসিল। বন্ধুরা শুধাইল —কিহে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ নাকি? ওটা মন্দ উপায় নয়, বিয়ে দিয়ে সেই টাকায় পড়াও।

বিবাহের সম্বন্ধ নয়। কলিকাতার ৫।৭টি কলেজ হইতে এবং মফঃস্বলের ৮।১০টি কলেজ হইতে যদুবাবুকে অভিনন্দন করিয়া পত্র আসিয়াছে। কলেজের অধ্যক্ষেরা যদুবাবুকে নমস্কারান্তে জানাইয়াছেন যে, শ্রীমানের অভূতপূর্ব্ব কৃতিত্বে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীমানকে পড়াইবার ভার পাইলে গৌরববোধ করিবেন, ইত্যাদি। সর্ব্বশেষে উল্লেখ আছে যে, শ্রীমান তাঁহাদের কলেজে ভর্ত্তি হইলে টাকা পয়সার চিন্তা যদুবাবুকে করিতে হইবে না।

যদুবাবু কলিকাতার কুলীন কলেজের পত্রগুলি রাখিয়া মফঃস্বলের পত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। যদুবাবুর তৈজসপত্র এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

বন্ধুরা বলিলেন—কলেজগুলো প্রথমে যাচাই ক'রে নিয়ো—কে কি দিতে চায় দেখে ভর্ত্তি ক'রো, নইলে ঠ'কে মরবে।

বন্ধুরা যদুবাবুকে চিনিতে পারে নাই—নতুবা অস্থানে এমন উপদেশ দিত না।

তারপরে একদা শুভদিন দেখিয়া সপুত্রক যদুবাবু কলিকাতা রওনা হইলেন।

২

শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিতেই হোটেলের চাপরাশধারী আরদালীর মত একপাল লোক যদুবাবু ও তাঁর পুত্রের উপরে আসিয়া পড়িল।

যদুবাবু শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আমরা হোটেলে উঠ্‌বো না।

ভীড়ের মধ্য হইতে একজন বলিল—হোটেল কোথায়? আমরা কলেজের লোক; দেখছেন না আমার চাপরাশে লেখা আছে বভ্রুবাহু কলেজ! কেমন চকচকে চাপরাশ দেখছেন!

আর একজন তাকে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—ওর চাপরাশ চক্‌চকে মানে কি জানেন? নূতন কলেজ! আমার চাপরাশে দেখুন মরচে ধরেছে, মানে বনেদী কলেজ, বীরবাহু কলেজের নাম শোনেন নি! বাংলাদেশের বারো আনা গ্র্যাজুয়েট এই কলেজ থেকে বেরিয়েছে।

বজ্রবাহু হটিবার লোক নয়—সে বলিল—ওদের কলেজ নয়, হাট, ওখানে কি পড়া হয়, রামচন্দ্র! আমাদের কলেজে সাত জন প্রফেসার পি-এইচ-ডি, পনর জন পি-আর-এস, বার জন গোল্ড মেডালিষ্ট, ছাব্বিশ জনের কল্‌কাতার বাড়ী আছে—আর পঁয়ত্রিশ জনের ওজন আড়াই মনের উপর।

বীরবাহু হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বিদ্যা হচ্ছে মাথার জিনিষ—ওজন দিয়ে কি হ'বে!

বজ্রবাহু তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—ওজন দিয়ে কি হ'বে—শুনুন একবার কথা! আমাদের কলেজের প্রফেসাররা মোটা মাইনে পায়, খায় দায় ভাল, তাই মোটা হ'য়েছে।

তারপরে সে গলার স্বর নামাইয়া বলিল—জানেন স্তর, ওদের কলেজের প্রিন্সিপালের মৃগীরোগ আছে।

বীরবাহু প্রটেষ্ট করিবার আগেই বজ্রবাবু বলিলেন—তা'তে আমার কি ক্ষতি।

বজ্রবাহু একটি ছাত্রমোহন হাসি হাসিয়া বলিল—ক্ষতি এই যে ওদের কলেজের প্রফেসারেরা চাকরি রাখবার জন্ত মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যায়। বুঝলেন না স্তর, প্রিন্সিপালের মৃগী রোগ থাকাতে কে কতবার মূর্চ্ছা যায় সেই হিসাবে ওদের মাইনে বাড়ে। এখন আপনি বিচক্ষণ লোক বিবেচনা ক'রে দেখুন, প্রফেসারেরা মূর্চ্ছা গেলে ছাত্র পড়াবে কখন?

এমন সময় 'ভারতবন্ধু' কলেজ অগ্রসর হইয়া বলিল—স্তর আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমাদের কলেজে যারা চাকরি পায় না, তারাই ওসব কলেজে যায়।

যত্নবাবু বলিলেন—আপনারা এখন যান, আমি বিবেচনা ক'রে যেখানে খুসী যাবো।

ইহা শুনিয়া তিনজনেই সমস্বরে বলিল—এ-তো ঠিক কথা—উনি বিবেচনা ক'রে যাবেন।

এই বলিয়া তিনজনে পিতা পুত্রকে ধরিয়া টানাটানি সুরু করিল।

'বীরবাহু' পিতাকে ধরিল, 'ভারতবন্ধু' পুত্রের হাত ধরিল, 'বজ্রবাহু' একেবারে শিকড় ধরিল অর্থাৎ পুত্রের দুই পা শক্ত করিয়া ধরিল, 'ভারত-বন্ধু' হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল; বিষম টানে তার জামা খুলিয়া 'ভারতবন্ধুর' হাতে চলিয়া আসিল।

পুত্র কাঁদিয়া উঠিল—বাবা আমার পিরাণ।

বজ্রবাহু অমনি পকেট হইতে একমুঠ লজেঞ্চুস বাহির করিয়া তার মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল—খোকা কেঁদো না, তোমাকে সিল্কের জামা তৈরী ক'রে দেবো। এই বলিয়া পুত্রকে কাঁধে ফেলিয়া সতীদেহবাহী পাগল মহাদেবের মত দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া পড়িল। অগত্যা যত্নবাবুও সেই ট্যাক্সিতে উঠিলেন।

'ভারতবন্ধু' পুত্রের জামা ও 'বীরবাহু' পিতার সুটকেস লইয়া প্রস্থান করিল।

যত্নবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলে 'বজ্রবাহু' হাসিয়া বলিল—সেজন্য চিন্তা করবেন না, সময়মত সব ফিরে পাবেন।

ট্যাক্সি ছুটিল।

৩

বজ্রবাহু কলেজে এডমিশন বোর্ড বসিয়াছে। ছোট একটি ঘর, আলমারীর প্রাচীর সাজাইয়া সেটাকে ক্ষুদ্রতর করিয়া তোলা হইয়াছে, মাঝখানে একখানা বনেদী টেবিল অর্থাৎ অতিশয় পুরাতন ও জীর্ণ, চারপাশে কতকগুলি সজীব চেয়ার অর্থাৎ ছারপোকা-অধ্যুষিত, মাথার উপরে বিদ্যুতের পাখা এবং সেই পাখার নীচে এডমিশন বোর্ডের মেম্বারদের মাথা, মেম্বারগণ সেই সব সজীব চেয়ারে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তির মত উপবিষ্ট।

সবচেয়ে ভাল গদিআঁটা চেয়ারে যদুবাবু বসিয়া আছেন। তিনি পকেট হইতে একটি মরিচাধরা টিনের বাক্স বাহির করিয়া—একটি বিড়ি বাহির করিলেন। অমনি 'এডমিশন বোর্ড' সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই যিনি বজ্রবাহু কলেজের এজেন্ট সাজিয়া ষ্টেশনে গিয়াছিলেন—এখন তিনি ভাগলপুরী সিল্কের জামা-চাদরে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত বেশে একখানি চেয়ারে আসীন, তিনি অর্থাৎ ভূ-মণ্ডলবাবু (পাঠক, আমি কি করিব, ওটা তাঁর পিতৃদত্ত নাম; পিতৃদত্ত নামের মাহাত্ম্য রক্ষার জন্য দরজির বিল বাড়াইয়াও ক্রমশঃ তিনি ভূরিষ্ঠ হইতেছেন।) একটি সিগারেটের বাক্স যদুবাবুর সম্মুখে আগাইয়া দিলেন। যদুবাবু নিজের টিনের বাক্স হইতে বিড়িগুলি বাহির করিয়া বাক্সের সব কয়টা সিগারেট তার মধ্যে সাজাইয়া রাখিয়া একটি ধরাইলেন।

যদুবাবু ইঙ্গিতে পাখা বন্ধ করিবার অনুরোধ করিয়া সিগারেট টানিতে লাগিলেন। ভূমণ্ডল বাবু শুধাইলেন—স্তর, পাখা বন্ধ কেন? যদুবাবু বলিলেন—নইলে সিগারেট তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়—পয়সা নষ্ট করে' কি লাভ!

যদুবাবু যেন নিজের পয়সাতে কেনা সিগারেট টানিতেছেন! যদুবাবু জুন মাসের দুপুরবেলার বদ্ধঘরে সিগারেট টানিতে লাগিলেন—আর বজ্রবাহু কলেজের এডমিশন বোর্ড বসিয়া ঘামিতে লাগিলেন।

পাঠক, তুমি ভাবিতেছ এতকাণ্ড যার জন্ম যদুবাবুর সেই পুত্রটি কোথায়? মধু (যদুর পুত্র যে মধু হইবে ইহা জানিবার জন্ম আশা করি মিলজ্ঞ কবি হইবার প্রয়োজন নাই) এখন রাহুগ্রস্ত শশিকলার মত কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ক্রোড় আসীন।

সুপার (ওটা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সংক্ষেপ—তাঁহার মাহিনা না কমাইয়াও কথাটাকে ছোট করিতে পারি!) শুধাইলেন—আচ্ছা বাবা, তোমাদের বাড়ীর উত্তর দিকে একটা উঁচু টিলা আছে, নয়?

মধু বলিল—কই, না। উত্তর দিকে তো ধান ক্ষেত।

—তারপরে?

মধু বলিল—তার পরে তো বিল।

সুপার বলিলেন—তারপরে?

মধু ভাবিয়া পাইল না তারপরে কি?

সুপার দুই চোখে স্নেহবৃষ্টি করিয়া বলিলেন—কেন? হিমালয় পর্ব্বতের কথা পড়নি?

মধু প্রবেশিকায় প্রথম হইয়াছে—সে বলিল, সে তো ভারতবর্ষের উত্তর দিকে।

সুপার হাসিয়া বলিলে—তবেই তোমার বাড়ীরও উত্তর দিকে হ'ল।

মধু তাঁহার বিদ্যার পরিধি দেখিয়া বিস্মিততর হইল—আগেই তাঁহার উদরের পরিধি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে যদুবাবুর ধূমপান শেষ হইয়াছে, পাখা আবার ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এডমিশন বোর্ডের কপালের ঘাম ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত হইয়াছে।

তখন যদুবাবু কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিলেন। চশমাটাকে ভাল করিয়া মুছিয়া নাকের খাঁজে বসাইয়া বলিলেন—তা হ'লে কি কি দিচ্ছেন?

সুপার তখন পুত্রকে ছাড়িয়া পিতার দিকে মন দিলেন।

তিনি বলিলেন, জানেন তো স্যর, কবীর সাহেব কি বলেছেন—

"সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদবতাওয়ে,
জ্ঞান কর উপদেশ
তব্ কয়লা কি ময়লা ছোড়ে,
যব্ আগ্ কর পরবেশ।"

এই বলিয়া তিনি তাঁর দুটি চোখকে দুটি সন্ধানী বাতির মত যদুবাবুর চিত্তাকাশের দিকে নিক্ষেপ করিলেন—অতর্কিত প্রতিকূলভাবের বিমান আসিবামাত্র যাহাতে ধরা পড়ে।

তাঁর চোখের চশমার—একটা খোপে কাচ আছে—আর একটা শূন্য, এক চোখে হাসি পিতার প্রতি নিক্ষিপ্ত, এক চোখে জল ফোঁটা ফোঁটা পুত্রের মাথায় পড়িতেছে, এক চোখে দয়া, অন্য চোখে ধিক্কার; এক চোখ চকোরের মত সুধা প্রার্থনারত, আর এক চোখ চাতকের মত তৃষ্ণায় বুকফাটা, এক চোখে শিব আর এক চোখে শিবানী, এইরূপে যুগল চোখের হরগৌরী দৃষ্টি যদুবাবুর দিকে নিক্ষেপ করিয়া তিনি পাঁচ মিনিট ধরিয়া রহিলেন।

অন্যদিকে 'এডমিশন বোর্ড' আশা আশঙ্কায় দণ্ড পল গুণিতে লাগিলেন, এডমিশন বোর্ডের নিকট সুপারের ওই দৃষ্টি কলেজের জাতীয় সম্পত্তি—কত আসন্ন বিপদ যে ওই দৃষ্টিতে কাটিয়া গিয়াছে—তাহার সংখ্যা নাই। একবার জাঁদরেল এক D. P. I. কলেজ পর্য্যবেক্ষণে আসিয়া কি একটা গলদ যেন ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন—অমনি সঙ্গে সঙ্গে

ওই দৃষ্টি তাঁহার উপরে গিয়া পড়িল—সাহেব টলিতে টলিতে মোটরে গিয়া উঠিলেন—কথাটি পর্য্যন্ত বলিবার অবকাশ পাইলেন না।

পাঁচ মিনিট ঘর নিস্তব্ধ।

কিন্তু হায়, জগতে অজেয় বোধ করি কিছুই নাই। যদুবাবু কিনা বলিয়া উঠিলেন—ওসব তো বুঝলাম, বিকাল বেলা ফল খাবার জন্যে মাসে গোটা দশেক টাকা দিতেই হবে। বুঝলেন না, ফলের রস খেলে তবে তো মাথা ঠিক থাকবে।

হা হতোস্মি। এডমিশন বোর্ডের মেম্বারদের সমতালে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল—আর সেই সমবেত নিঃশ্বাসের বাতাসে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডার খানা কাঁপিয়া উঠিয়া ছবির মেয়েটার মুখে যেন বিদ্রূপের হাসি ফুটিল।

আর এই পরাজয়ে সুপাবের আত্মগ্লানির চেয়ে শাস্ত্রগ্লানি অধিকতর হইল। তবে কি শাস্ত্র অভ্রান্ত নয়? নতুবা এদৃষ্টি তো ব্যর্থ হইবার নয়। বাড়ী ফিরিয়া একবার ঘেরণ্ড সংহিতাখানা দেখিতে হইবে—আর অমনি গুরুঠাকুরকেও প্রণামী পাঠাইয়া দিতে হইবে।

৪

পাঠক, ব্যাপার আর কিছুই নয়। আজ সেই বেলা দশটা হইতে—এখন বেলা পাঁচটা, এডমিশন বোর্ডের দর কষাকষি চলিতেছে। যদুবাবু বলিয়াছেন নিম্নলিখিতরূপ টাকা ও সুবিধা পাইলে তিনি মধুকে (যে অচিরকালের মধ্যে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিবে) বজ্রবাহু কলেজে ভর্তি করিয়া দিতে পারেন।

(ক) মাসিক বৃত্তি—৩০৲ টাকা।

(খ) বই কিনিবার জন্য এককালীন—৯৩।৶০ আনা।

(গ) নূতন ধুতি জামা খরিদের জন্য—৫৩।০ আনা।

(ঘ) শিয়ালদহ ষ্টেশনে জিনিষপত্র খোয়া গিয়াছে, তার ক্ষতিপূরণ—১৫০৸৫ আনা।

(ঙ) যদুবাবুর একেবারের যাতায়াতের খরচ—১৩।০ আনা।

(চ) যদুবাবুর মাসে একবার করিয়া পুত্রকে দেখিতে আসিবার যাতায়াতী খরচ—ঐ।

(ছ) পুত্রের মাসিক হাত খরচ—১২৷৷০ আনা।

(জ) পিতার মাসিক কলিকাতার আসাকালীন হোটেল খরচ দৈনিক ২।০ আনা হিসাবে।

(ঝ) মধুকে গ্রীষ্মাবকাশে দার্জ্জিলিংএ এক মাস থাকিবার খরচ—১৫০৲।

(ঞ) ঐ যাতায়াতী খরচ—নূতন টাইমটেব্‌লে যে ভাড়া লিখিত থাকিবে তাহা।

(ট) পূজাবকাশে মধুকে পুরীতে একমাস রাখিবার খরচ ১৫০৲ টাকা।

(ঠ) তথায় যাতায়াতী ভাড়া—(ঞ) ধারায় লিখিত মত।

(ড) বড়দিনের ছুটিতে ভারতবর্ষে cultural tour করিবার খরচ ২৫০৲ টাকা।

(ঢ) যদুবাবুর সম্মানার্থ গরদের ধুতি চাদর এক জোড়া—২২৷৷০ আনা।

(ণ) মধুর বিকালবেলা ফল খাইবার বাবদ মাসিক ১০৲ টাকা।

'এডমিশন বোর্ড ভাবিতেছেন—বাপ্‌রে কত লম্বা ফর্দ্দ।

যদুবাবু মনে মনে আক্ষেপ করিতেছেন—বর্ণমালার এখনো অনেকগুলি অক্ষর বাকি রহিয়া গেল।

গোলমাল বাধিয়াছে—মূর্দ্ধন্য—ণকে লইয়া।

ভূমণ্ডল বাবু বলিলেন—স্যার লেটেষ্ট ওপিনিয়ন হচ্ছে যে, ফল খাওয়াটা শরীরের পক্ষে মোটেই অত্যাবশ্যক নয়।

যদুবাবু কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে একখানা সচিত্র খাদ্য-তত্ত্ব বাহির করিয়া বিশেষ একটা অধ্যায় খুলিয়া ভূমণ্ডলবাবুর হাতে দিলেন—বলিলেন—পড়ে দেখুন।

ভূমণ্ডলবাবু সচিত্র খাদ্যতত্ত্বের 'ফলাহার' অধ্যায় পড়িতে লাগিলেন।

যদুবাবু বলিলেন—বুঝলেন, এ এমন বেশী কিছু নয়, 'ভারতবন্ধু' কলেজ এমন কি খেন্তির বিবাহের সাহায্যবাবদও কিছু দিতে স্বীকার করেছিলেন।

—তারপরে টীকা করিয়া বলিলেন—খেন্তি আমার ছোট মেয়ে। টীকার কোন প্রয়োজন ছিল না।

—কিন্তু আমি ওখানে দিতে রাজী নই। ওখানে মেয়েরা পড়ে কিনা! জানেন তো ঘি আর আগুন—অর্থাৎ—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিস্মৃত যৌবনের একটা মরচে-ধরা হাসি নিক্ষেপ করিয়া ভূমণ্ডলবাবুকে বলিলেন—আমরাও তো এক সময়ে যুবক ছিলাম—কি বলেন?

ভূমণ্ডলবাবু তখন কমলা লেবুর গুণ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি মুখ তুলিয়া শুধাইলেন—কি?

যদুবাবু কিঞ্চিৎ ভুল করিয়াছেন। ভূমণ্ডলবাবু কখনো যুবক ছিলেন না। তিনি জন্মিয়াই মাষ্টার—যাঁহারা জাত মাষ্টার তাঁহাদের কাছে জীবনের চরম বিভাগ সিনিয়ার ও জুনিয়ার, যৌবন, বার্দ্ধক্য—ও সব কেবল মায়া।

জগতে এমন সহিষ্ণুতা নাই, যাহা অসীম, এডমিশন বোর্ডের সভ্যরা মাষ্টার হইলেও সজীব চেয়ারের তীব্র আক্রমণে তাঁহাদের ধৈর্য্য নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। কর্ণ নাকি বজ্র-বৃশ্চিকের দংশন সহ্য করিয়াছিল,

আরশোলার আক্রমণ তাহাকে সহিতে হয় নাই—নতুবা মহাভারতের গতি অন্যরকম হইত।

এডমিশন বোর্ড যদুবাবুর 15 points স্বীকার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

তারপরে জল খাবার আসিল। যদুবাবু নিজের প্লেট শেষ করিয়া একে একে মেম্বারদের সকলের প্লেট শেষ করিয়া, কেবল ঘরের চেয়ার টেবিলগুলি বাদ রাখিয়া (যদুবাবু আবার নিরামিষাশী, তাই বোধ করি সজীব টেবিল চেয়ার এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল) উঠিয়া পড়িলেন। আর এডমিশন বোর্ড নিস্তব্ধ বিস্ময়ে যদুবাবুর great hunger লক্ষ্য করিয়া নিজেদের বর্ত্তমান ও মধুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হইলেন।

সকলে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতেছেন—এমন সময়ে টেবিলের নীচ হইতে একটা সুবৃহৎ কুকুর বাহির হইয়া ছুটিয়া পালাইল।

একজন বলিল—ইস, কত বড় কুকুর !

আর একজন বলিল—কি রকম লোম—যেন বিলিতি কম্বল !

তাঁহারা অন্য এক ঘরে গিয়া দেখিতে পাইলেন ৫।৭ শত ছেলে কাগজ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ৮।১০ জন কেরাণী টেবিলে কি লিখিয়া চলিয়াছে। যদুবাবুর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটিল।

ভূমণ্ডলবাবু বলিলেন—এরা আমাদের লক্ষ্মী অর্থাৎ পয়সা দিয়ে পড়বে। আর যে ঘরে আমরা ছিলাম, সে ঘরে সব সরস্বতী—অর্থাৎ ভাল ছেলের দল—যারা পড়বে অথচ পয়সা দেবে না।

লক্ষ্মী-সরস্বতীর লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া যদুবাবু বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

৫

গভীর নিশীথে যদুবাবুর ঘরের দরজায় টোকা পড়িল। তিনি দরজা খুলিয়া দিতেই 'বীরবাহু' কলেজ প্রবেশ করিলেন।

'বীরবাহু' বলিলেন—স্যর—আমরা 'ফ' পর্য্যন্ত দিতে রাজি আছি।

যদুবাবু শুধাইলেন, তার মানে?

'বীরবাহু' বলিলেন—ওরা 'প' পর্য্যন্ত concession দিয়েছে—আমরা তার পরে আরও কয়েক দফা জুড়ে দিয়ে 'ফ' পর্য্যন্ত যেতে সম্মত আছি।

যদুবাবু শুধাইলেন—আপনি 'প'র কথা কি ক'রে জানলেন?

এবারে বীরবাহু হাসিলেন। দুর্য্যোধনের মুকুট ছলনা করিয়া লইয়া আসিয়া যুধিষ্ঠির বোধ হয় এমনি করিয়া হাসিয়াছিল!

বীরবাহু বলিলেন—কুকুরটা দেখেছিলেন?

যদুবাবু বলিলেন—হাঁ।

'বীরবাহু' বলিলেন—আমিই সেই কুকুর!

যদুবাবু বিস্ময়ের মুখ-ব্যাদানকে একটী হাইতোলাতে পরিণত করিয়া ফেলিলেন।

—তবে বলি, শুনুন স্যর, ওরা কি কি concenssion দেবে জানবার জন্য আমি কাল রাত্রে একটা কুকুরের মেক-আপ করে গোপনে গিয়ে টেবিলের নীচে বসেছিলাম—সব শুনে ফেলেছি।

যদুবাবু বলিলেন—কিন্তু কুকুর সাজলেন কি করে?

'বীরবাহু' বলিলেন—আজকাল সিনেমার যুগে মেক-আপের কত উন্নতি হ'য়েছে। তা' ছাড়া এতে বিস্মিত হচ্ছেন কেন? মানুষের কুকুর সাজা তো সহজ। কত কুকুর মেক-আপের জোরে মানুষ বলে চলে যাচ্ছে।

যদুবাবু বলিলেন—তা না হয় হ'ল। কিন্তু আপনারা শিক্ষক, আপনাদের এই নীচকাজ কি করা উচিত। আপনাদের উপরে ভার জাতি গঠনের—

জাতি গঠনের কথা শুনিয়া 'বীরবাহু' সেই জুন মাসের গভীররাত্রে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

যদুবাবু বলিলেন—কাঁদছেন কেন?

বীরবাহু বলিলেন—বড দুঃখে। তবে শুনুন—এই বলিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—

জাতি গঠন কেউ চায় না—সকলেই চায় নিজের নিজের স্বার্থ। গভর্ণমেণ্ট চায় মন্ত্রিত্ব বজায় রাখতে, লীডারেরা চায় নিজের দল বজায় রাখতে, সাংবাদিক চায় কাগজের গ্রাহক সংখ্যা ঠিক রাখতে, দেশের লোকে চায়—কি চায় জানি না, বোধ করি বিনা হাঙ্গামায় জীবনযাপন করতে। কারো উপরে কোন ভার নেই—কাঁরো কোন দায়িত্ব নেই—সব ভার এই মাষ্টারদের উপর?

যদুবাবু বলিলেন—আপনারা যা পারেন—করুন না।

বীরবাহু বলিল—না, ও রকম করে কিছু হয় না, হ'বার নয়। যে-ভার সকলে চেষ্টা করলে তবে বহন করা সম্ভব তা কেবল মাষ্টারদের উপর ছেড়ে দিলে।কেন চলবে? আর সমাজে আমাদের কি কোন মর্য্যাদা আছে? আমরা মন্ত্রী নই, লীডার নই. সাংবাদিক নই, খেলোয়াড় নই, সিনেমাষ্টার নই—এমন কি ছাত্রও নই।

গভর্ণমেণ্টের আমরা চক্ষুশূল, যেহেতু আমাদের জন্যই নাকি দেশে শিক্ষিতের (!) সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। লীডারেরা আমাদের ঘৃণা করে, সাংবাদিকরা আমাদের কৃপা করে, অভিভাবকেরা (মাহিনা না জানা পর্য্যন্ত) আমাদের সম্মান করে, আর ছাত্ররা আমাদের উপর এমন নিষ্করুণ যে, পরিপূর্ণ ধর্ম্মঘটের দিনেও সব ছেলে ক্লাশ ছেড়ে যায় না। দুই

চারজনের জন্য পুর্ণোদ্যমে আমাদের চীৎকার করে যেতে হয়, আর কলেজের কর্তৃপক্ষ আমাদের কি দৃষ্টিতে দেখেন তা এই অন্ধকারে বলতেও সাহস হচ্ছে না। কেবল যখন মাহিনা বাড়াবার কথা বলি, তখন শুনি—এ প্রতিষ্ঠান নাকি আমাদেরই। আমাদের বেতন এতই কম যে, নিজের স্ত্রীর কাছেও বলতে লজ্জা বোধ করে। পেটে ক্ষুধা নিয়ে কি জাতিগঠন করা যায়! যারা নিজের উদরান্ন সংস্থান করতে অক্ষম, দেশের লোক তাদের উপর জাতিগঠনের ভার দিয়েছে। কি ভণ্ডামি। দেশের লোকের ভাবটা এই রকম যে, আমরা নিজের নিজের উন্নতি করি—তোমরা দুপুরবেলা আমাদের ছেলেমেয়েকে পড়াবার ছলে কলেজে আটকে রাখো—যেন তারা ট্রাম-বাস চাপা না পড়ে।

আমরা উদরান্নের জন্য কেউ দর্জ্জির দোকান করি, কেউ বড়লোকের বাড়ী ম্যানেজারি করি, কেউ ওকালতী করি, কেউ গোরুর রাখাল ছাড়িয়ে দিয়ে নিজের গোরুর ঘাস নিজেই কাটি, আর যারা প্রাইভেট টিউশনের নামে ছাত্রের পিতার হাট-বাজার করে তারা তো আমাদের মধ্যে নিতান্ত সাত্ত্বিক। দেশশুদ্ধ লোকের ময়লা কাপড় কাচার ভার আমাদের উপর—আমরা ।আধ্যাত্মিক ধোপা! এত ফাকি বিধাতা কি ভাবে সহ্য করবেন!

—এই বলিয়া তিনি কড়িকাঠের দিকে চাহিলেন—যেন বিধাতা ওখানে টিকটিকির মত ছাদে লেপ্‌টিয়া বিরাজ করিতেছেন।

যদুবাবু বলিলেন—যা বলছেন তা মিথ্যা নয়। কিন্তু আপনাদের কলেজে কলেজে তো এমন রেষারেষি থাকা উচিত নয়!

—উচিত নয় বুঝি!—'বীরবাহু' বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু ক্ষুধিতের কি তত্ত্বজ্ঞান আছে? ছাত্রসংখ্যার উপরে যেখানে মাষ্টরদের বেতন নির্ভর করে—সেখানে কাণ্ডজ্ঞান, ভদ্রতা, সৌজন্য—এসব কথা বাতুলতা মাত্র! একটি ছাত্রকে যদি ভাল করে পাশ করাতে পারি, তা দেখে

হাজার হাজার ছাত্র আসবে, দেওয়ালীর রাতের পতঙ্গের মত একটি উজ্জ্বল দীপশিখাকে লক্ষ্য করে। এসব উচিত নয়, অন্যায়, অনৈতিক সবই জানি। কিন্তু ক্ষুধা যে নিয়মিত দুই বেলা পায়; আসন্ন বিবাহ-যোগ্যা মেয়ের বয়স যে দাড়ির মত বিনা সাধনাতেই বেড়ে চলে, পুত্র কন্যার কঠিন ব্যাধিতে মৃত্যুভীতির চেয়ে অর্থ চিন্তা প্রবলতর হয়। আর কিছুদিন বাদে দেখবেন চা-বাগানের আড়কাঠির মত কলেজের এজেন্ট দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়বে, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দাদন করে আসবে। স্বার্থপর ব্যবহারের জন্য যদি দেশের আর কাউকে দোষ না দেন—তবে শুধু মাষ্টারদের দোষ দিলে কেন চলবে? তারা তো মানুষ, ক্ষুধিত মানুষ—A hungry nation has no philosophy!—এই পর্য্যন্ত বলিয়া 'বীরবাহু' থামিলেন।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া যদুবাবু বলিলেন—আপনাদের 'ক' ও ওঁদের 'প' ও দুইই থাক্।

—তার মানে?

যদুবাবু বলিলেন—ছেলেকে পড়াবো না।

'বীরবাহু' লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—সে কি? তবে কি করাবেন?

যদুবাবু বলিলেন—পৈত্রিক কিছু ব্রহ্মত্র আছে—তাই গিয়ে চাষ করবে।

'বীরবাহু' বলিলেন—তা'তেও যে পয়সা লাগবে?

যদুবাবু বলিলেন—কিছু ঘটিবাটি এখনো আছে।

বীরবাহু বলিলেন, যেন আপন মনেই—ম্যাট্রিকুলেশনে ফার্ষ্ট-হওয়া ছেলে কলেজে না পড়ে' শেষে চাষ করবে! কি সর্ব্বনাশ—দেশের হ'ল কি?

যদুবাবু বলিলেন—যদি কিছু মনে না করেন তবে বলি আপনিও আমার সঙ্গে চলুন।

—কেন?

—আপনাকে কিছু জমি দেবো—চাষ করবেন।

—চাষ করবো?—'বীরবাহু' লাফাইয়া উঠিলেন, এতক্ষণে তাঁহার আত্মমর্য্যাদাবোধ ফিরিয়া আসিল। তিনি ক্রোধে, বিস্ময়ে, ক্ষোভে, ধিক্কারে বলিতে লাগিলেন—আপনি কি মনে করেন? আমি চাষ করবো? আমি হ'ব চাষা? আমি কাল্‌চারের পথ ছেড়ে এগ্রিকাল্‌চার ধরবো? কৃষ্টি ছেড়ে ধরবো কর্ষণ? ধিক্!

বিস্মিত যদুবাবু বলিলেন—কিন্তু এত অপমান সহ্য করে—

—অপমান?—'বীরবাহু' বলিতে লাগিলেন—না হয় দুটো কথা এখানে শুন্‌তে হয়—কিন্তু তা বলে চাষা হ'তে পারিনে।—এই বলিয়া তিনি যদুবাবুর প্রতি একটা ধিক্কারের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় যেন ভুল করিয়াই যদুবাবুর সিগারেটের কৌটাটা হাতে করিয়া লইয়া গেলেন।

*

যদুবাবু তখনি নিদ্রিত পুত্রকে ঠেলিয়া জাগাইয়া বিছানাপত্র বাঁধিয়া রওনা হইলেন। অত রাত্রে ট্রেণ নাই—তবু তিনি ষ্টেশনে গিয়া বসিয়া থাকা স্থির করিলেন। কি জানি ভোর হইবামাত্র যদি আবার কলেজের এজেন্টরা আসিয়া উপস্থিত হয়।

ঘুমের ঘোরে মধু জিজ্ঞাসা করিল—বাবা এবারে কোন্ কলেজ?

চাষের নাম শুনিয়া পাছে ছেলে আপত্তি করে তাই তিনি বলিলেন—এগ্রিকালচারাল কলেজ।

গভীর রাত্রে সপুত্রক যদুবাবু হোটেল ত্যাগ করিলেন, ম্যানেজার ঘুমাইতেছিল, কাজেই বিলশোধ আর করিতে হইল না।

পরদিন তাঁহারা পলাশপুরে গিয়া পৌঁছিলেন। যদুবাবুর তৈজসপত্রের দুর্ভাগ্য—এ যাত্রা তাহারা রক্ষা পাইল না।

চিত্রগুপ্তের এড্‌ভেঞ্চার

এক দিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীমান্ চিত্রগুপ্ত নন্দন-বনের ধারে বসিয়া পারিজাতের ডাল দিয়া দন্ত-মার্জ্জনা করিতেছিল। এমত সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন,—বৎস চিত্রগুপ্ত, তোমাকে একবার বঙ্গদেশে যাইতে হইতেছে।

এই অশুভ সংবাদে চিন্তিত হইয়া চিত্রগুপ্ত শুধাইল—পিতামহ, হঠাৎ এরূপ আদেশের কারণ কি? পিতামহ বলিলেন, তবে শোন। অনেক দিন হইল বঙ্গদেশ হইতে যে সব রিপোর্ট আসিতেছে, তাহাতে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। তরুণ দেবতারা বলিতেছে—পিতামহ বুড়া মানুষ, তাহার নিশ্চয় ভুল হইয়াছে। আর তাড়াতাড়িতে এতবড় বিশ্ব-সৃষ্টির সময়ে যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে।

চিত্রগুপ্ত শুধাইল—ভুলটা কি?

পিতামহ বলিলেন—তাহারা বলিতেছে বঙ্গজাতি সৃষ্টি করিবার সময়ে আমি না কি তাহাদের মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক অর্থাৎ বুদ্ধি ভরিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এতদিন ঘটনাটা চাপা ছিল, সম্প্রতি বঙ্গদেশ হইতে যে সব খবর আসিতেছে তাহাতেই এই তথ্যটা ধরা পড়িয়াছে।

চিত্রগুপ্ত বলিল—সে কি পিতামহ, মস্তিষ্ক ছাড়া কি মানুষ হয়?

ব্রহ্মা বলিলেন—হয় কি না হয়, অনুসন্ধান করিবার জন্যই তোমাকে একবার কষ্ট করিয়া বঙ্গদেশের রাজধানীতে যাইতে হইবে। মনে রাখিও তোমার রিপোর্টের উপরেই বঙ্গজাতির অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। সত্যই যদি উহাদের মাথার মধ্যে বুদ্ধি দিতে ভুল হইয়া গিয়া থাকে—তবে জাতিটাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। ইতিমধ্যে

দেবতারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে 'এনকোয়ারি কমিটী' বসাইয়াছে, তাহার কাজ বন্ধ থাকিবে।

দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া চিত্রগুপ্ত রঙ্গদেশে যাইতে প্রস্তুত হইল, ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি ফিরিয়া আসিলে তোমার মাহিনার বিষয় বিবেচনা করিব।

২

চিত্রগুপ্ত রঙ্গজাতির বেশে রঙ্গদেশের রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

একদিন সে দেখিতে পাইল সুদীর্ঘ এক জন-প্রবাহ রাজপথ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহাদের হাতে লালরঙের পতাকা; পতাকায় নানারূপ বাণী লিখিত, মুখে মুখে মুহুর্মুহু 'মিলমিলাব কৈজাবাদ' ধ্বনি। এই শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে যাহারা চলিয়াছে তাহাদের অতি দীনবেশ, কিন্তু যতই পিছনে যাওয়া যায় লোকের বেশ-ভূষা মূল্যবান, সবশেষে যাহারা আছে তাহারা মোটরে ও অশ্বযানে চলিয়াছে। চিত্রগুপ্ত এ হেন দৃশ্য কখনও দেখে নাই, কাজেই বুঝিতে পারিল না এ জাতীয় শোভাযাত্রার উদ্দেশ্য কি? তবে এটুকু বুঝিল, কিছু গুরুতর না ঘটিলে জনপ্রবাহ এরূপ ক্ষিপ্তভাব ধারণ করে না। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সে পতাকাধারী এক ব্যক্তিকে শুধাইল, মশাই এ শোভাযাত্রা কিসের জন্য? সে লোকটা বিস্মিত হইয়া বলিল, আপনি নিশ্চয় রঙ্গজাতির লোক নন, নতুবা এ প্রশ্ন আপনার মনে উঠিত না। তারপর কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া বলিল, এ জাতীয় প্রশ্ন করা মহাঅপরাধ। কিসের জন্য এ শোভাযাত্রা আমি জানি না। তবে ইহাতে যোগ না দিলে অপরাধ আরও গুরুতর তাই আসিয়াছি। আপনি পিছনে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

চিত্রগুপ্ত পিছনের একব্যক্তিকে এই প্রশ্ন করিল। সে বলিল, এ

প্রশ্ন কখনও আমার মনে জাগে নাই, জন্ম হইতেই এই জাতীয় শোভাযাত্রা দেখিতেছি। আপনি পিছনে জিজ্ঞাসা করুন।

চিত্রগুপ্ত ক্রমে পিছনে আসিতে লাগিল, কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না এই শোভাযাত্রার অর্থ কি। অবশেষে সে সবচেয়ে পিছনের মোটরারূঢ় এক নধরকান্তি পুরুষকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিল। সেই ব্যক্তি বলিল, দেখুন, আমি বুঝিতেছি আপনি নিশ্চয় রক্তজাতির লোক নন, কারণ তাহাদের মনে কখনও প্রশ্ন জাগে নাই। আপনাকে এই অঙ্গীকারে বলিতেছি যে, আপনি ইহা অপরকে বলিবেন না। আমার এক প্রবল শত্রুর একটি লোহার কারখানা আছে, প্রতিযোগিতায় আমার কারখানা কিছুতেই তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতেছে না, এমন চলিলে শীঘ্রই আমার সর্ব্বনাশ হইবে। তাই আমি দেশের লোককে ক্ষেপাইয়া দিয়াছি; সে লোকটা যে দেশের শত্রু ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছি, তার কারখানার মজুররা ধর্ম্মঘট করিয়াছে—এখন আমরা সকলে মিলিয়া চলিয়াছি সেই কারখানা ধ্বংস করিতে।

চিত্রগুপ্ত বলিল, লোকে কি প্রশ্ন করিল না? জানিতে চাহিল না কি করিয়া লোকটা দেশের অনিষ্ট করিতেছে?

নেতা বলিল, আগে ওরকম বিরক্তিকর প্রশ্ন করিত, কিন্তু যেদিন হইতে তারা আমার হেপাজতে তাদের মস্তিষ্ক 'safe deposit' রাখিয়াছে, তারপর হইতে প্রশ্ন করিবার মত বুদ্ধি আর তাহাদের নাই।

বিস্মিত চিত্রগুপ্ত বলিল, সে কি? সকলেরই তো মাথা দেখিতেছি।

নেতা বলিল, মাথা থাকিলেই মস্তিষ্ক থাকে না। দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলে আপনিও দেখিবেন এরা সবাই কবন্ধ।

চিত্রগুপ্ত বলিল, ভাল! কিন্তু ওই 'মিলমিলাব্ ফৈজাবাদ' ধ্বনির অর্থ কি?

নেতা বলিল, সিংহ যে গর্জ্জন করে তাহার অর্থ কি? শুনুন তবে

বলি, এ রঙ্গদেশ, এখানে অর্থ বলিতে ধাতু-মুদ্রা বুঝায়। অন্য কোন জাতীয় অর্থ এদেশে আশা করিবেন না। 'ঝিলমিলাব্‌ ফৈজাবাদ' ধ্বনিতে অর্থ নাই, কেবল শব্দ আছে—আর নিরর্থক শব্দে রঙ্গজাতি যেমন অনুপ্রাণিত হয় এমন আর কিছুতেই নয়।

এই ব্যাপার দেখিয়া চিত্রগুপ্তের মানসাকাসে ক্রমে ক্রমে চৈতন্যের ধূমকেতু উদিত হইতে লাগিল।

৩

রঙ্গদেশের রাজধানীর প্রান্তে এক হ্রদ আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিত্রগুপ্ত সেখানে যাইত, দিনের অভিজ্ঞতা পরিপাক করিবার জন্যও বটে, আবার সারাদিনের ঘটনার রিপোর্ট লিখিবার জন্যও বটে।

একদিন সে দেখিতে পাইল অদূরে একটি ঝাওড়া গাছের তলায় একখানা বেঞ্চিতে একটি তরুণী ও একটি যুবক উপবিষ্ট। তরুণীটি অতিশয় সুন্দরী।

চিত্রগুপ্তের চোখ উর্ব্বশী-মেনকা-প্রুফ, অর্থাৎ যাকে তাকে চোখে ধরে না। কিন্তু এ নারী যে-সে নয়, এমন কি তাহার স্বর্গীয় চিত্তও চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই পুরুষটির প্রতি সে ঈর্ষ্যা অনুভব করিল। দৈব-শক্তির বলে সে শুনিতে পাইল মেয়েটি যুবককে বলিতেছে, যতদিন না এই হ্রদের জল সমুদ্রের মত লবণাক্ত হয় ততদিন আমি তোমাকে ভাল-বাসিব। ইহা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত বুঝিল যুবকটির ভাগ্য ঈর্ষ্যা করিবার মত বটে।

পরদিন আবার সে রিপোর্ট লিখিবার জন্য এবং সেই তরুণীকে দেখিবার জন্য হ্রদের ধারে গেল। সে দেখিতে পাইল সেই তরুণীটি সেই

স্থানে বসিয়া আছে, কিন্তু এ কি! তার পাশে যে যুবকটি সে তো আগের দিনের ব্যক্তি নয়! আজও সে শুনিতে পাইল, মেয়েটি সেই পূর্ব্ব দিনের মত অঙ্গীকার করিতেছে, হ্রদের জল লবণাক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে তাহাকে ভালবাসিবে।

ইহার পর প্রতিদিন সেই মেয়েটিকে সে লক্ষ্য করিয়াছে, প্রতিদিন তাহার পাশে নূতন এক যুবক, কিন্তু প্রতিদিন সেই পুরাতন প্রতিজ্ঞা।

অবশেষে সে বুঝিল রঙ্গদেশের আধুনিকার বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত এবং সে বিবাহের স্থায়িত্ব একটি দিনমাত্র। সে ভাবিল, স্বর্গে গিয়া এই 'দিনান্ত' বিবাহ সম্বন্ধে গোটা-দুই বক্তৃতা করিবে।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় হ্রদের ধারে গিয়া আর সে তরুণীকে দেখিতে পাইল না। তার বদলে দেখিল, তরুণীর সঙ্গী যুবকদল হ্রদের ধারে বসিয়া হায় হায় করিতেছে, আর মাঝে মাঝে হ্রদের জল এক অঞ্জলি তুলিয়া মুখে দিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেছে। জল মুখে দিয়া কাঁদিবার কি কারণ ঘটিতে পারে বুঝিতে না পারিয়া সেও এক অঞ্জলি জল তুলিয়া মুখে দিল, দেখিল, হ্রদের জল সমুদ্রের মত লবণাক্ত। তরুণীর প্রতিজ্ঞার কথা মনে হইল। কিন্তু হ্রদের জল লবণাক্ত হইল কি রকমে?

সে পাশের একটি যুবককে ইহার রহস্যটা কি জিজ্ঞাসা করিল। যুবকটি বলিল, আর বলেন কেন? মেয়েটি, পাছে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, সেই ভয়ে রাতারাতি সাতাশ হাজার মন লবণ আনিয়া হ্রদের জল লবণাক্ত করিয়া দিয়াছে। রঙ্গজাতির আধুনিকারা পতিপরিবর্ত্তন করে কিন্তু মতি-পরিবর্ত্তন করে না। অঙ্গদান করে কিন্তু অঙ্গীকার দান করিলে তাহা যথাসাধ্য রক্ষা করে।

চিত্রগুপ্ত বলিল, তবে তো আপনাদের বড় দুঃখ দেখিতেছি?

যুবকটি বলিল, দারুণ দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনালাভ করা রঙ্গজাতির— অভ্যাস। আমরা হতভাগ্য এই কয়জন মিলিয়া এই হ্রদ ইজারা

লইয়াছি, এখন জল শুকাইয়া লবণ করিতে পারিলে দু'পয়সা ঘরে আসিবে; দ্বিগুন দামে বেচিতে পারিব, রাজধানীতে এক ছটাক লবণও নাই।

কিন্তু মেয়েটি গেল কোথায়?

যুবক বলিল, ওই লবণের পাইকারী ব্যবসায়ীর কাছে গিয়াছে।

সেখানেই কি বরাবর থাকিবে?

যুবকটি বলিল, কেমন করিয়া বলিব? ইহার পরে চিনি আছে, গুড় আছে, হ্রদের জলের কত রকম স্বাদপরিবর্ত্তন হইবে, দেখিতে পাইবেন।

চিত্রগুপ্ত শুধাইল, এমন রূপময়ী নারী হাতছাড়া হওয়াতে দুঃখ হইতেছে না?

যুবক বলিল, রূপ ভাল, কিন্তু রূপা আরও ভাল, ইহাকেই বলে, "ইকনমিক ইণ্টারপ্রিটেশন অব্ লাভ!"

চিত্রগুপ্ত সেইদিন হইতে হ্রদে যাওয়া ছাড়িয়া দিল।

৪

বঙ্গদেশের সাহিত্যের খ্যাতি স্বর্গ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল; চিত্রগুপ্ত শুনিয়াছিল এমন উচ্চদরের সাহিত্য না কি কোনও দেশে কখনও সৃষ্ট হয় নাই; সাহিত্য উচ্চদরের হইলে সাহিত্যিকরাও অবশ্য উচ্চদরের হইবেন, চিত্রগুপ্তের ইচ্ছা হইল একবার তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। স্বর্গে সে অবশ্য ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতিকে দেখিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা তো প্রাচীনকবি; আধুনিক কবিগণকে দেখিয়া সে জন্ম সার্থক করিবে।

সে 'সোমর'সের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একখানি টেবিলের চারিপাশে কয়েকজন সাহিত্যিক তাস খেলিতে বসিয়াছে, আর কয়েকজন ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই খেলা দেখিতেছে। খেলিতে খেলিতে পরস্পরের

প্রতি যে-সব বাক্য তাহারা প্রয়োগ করিতেছে, তাহা শুনিয়া চিত্রগুপ্তের কেমন যেন লাগিল,—ইহা কি ব্যাস-বাল্মীকির সগোত্রদের উচিত ভাষা!

আর একখানা টেবিল ঘিরিয়া একদল সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকা গুজগুজব করিতেছে। চিত্রগুপ্তের একটা বিষয় বড় রহস্যজনক বলিয়া মনে হইল—ইহারা সকলেই রক্তজাতির লোক, কিন্তু নামগুলা এমন বিদেশী কেন? কাহারও নাম বার্ণার্ড শ, কাহারো নাম জয়েস, কাহারও নাহারও নাম প্রুস্ত, কাহারও নাম এলিয়ট, কেহ স্পেণ্ডার, কেহ হুইটম্যান, কেহ বা ভার্জ্জিনিয়া উল্‌ফ। ব্যাপার কি?

কোন এক মাসিকপত্রে ইঁহাদের একজনের একখানা বইয়ের নিন্দা করা হইয়াছে, সেই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল।

প্রুস্ত বলিল, শালা লেখককে দেখে নেব, লিখব এমন এক প্রবন্ধ।

এলিয়ট বলিল, লিখে কি হবে? বেটার স্ত্রীকে বের করে নিয়ে সরে পড়ো।

বার্ণার্ড শ বলিল, তা হ,লে লোকটা বেঁচে যাবে। তার চেয়ে ও যখন গলি দিয়ে বের হয় ওর মাথায় মারো একখানা থান-ইট ছুঁড়ে।

স্পেণ্ডার বলিল, ওসব কিছু হবে না। চল ওর বাপের নামে কেচ্ছা লেখা যাক্।

ইহা শুনিয়া সকলে সমস্বরে 'হিপ হিপ, হুর্‌রে', করিয়া উঠিল।

আর একখানি টেবিলের পাশে কয়েকজন সাহিত্যিক বসিয়া নীরবে বোতল হইতে কি যেন ঢালিয়া ঢালিয়া পান করিতেছে। গন্ধটা যেন পরিচিত। ইন্দ্রের নৈশ দরবারে অনুরূপ গন্ধ অনেকবার সে দূর হইতে পাইয়াছে। ইহাদের কথা বলিবার পর্য্যন্ত অবকাশ ছিল না।

সে ফিরিয়া তাস-খেলোয়াড়দের কাছে গেল, তাহারা তখন তাস ছাড়িয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছে—ব্যাপার কি? অনেক অনুধাবন করিয়া বুঝিল, কারণ একজন রমণী। কে সেই রমণী? একটু সন্ধান

করিতেই দেখিতে পাইল, একান্তে এক সুন্দরী তরুণী উপবিষ্টা, হ্রদের ধারের বহু-বল্লভা সেই নারী।

ক্রমে ক্রমে সকলে সেখানে আসিয়া জড়ো হইল—তখন মারামারি গালাগালি এমন উচ্চগ্রামে উঠিল যে একটা কুরুক্ষেত্রের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। কেবল সেই যাহারা সন্দেহজনক পানীয় পান করিতেছিল তাহারা আসিল না, তখন তাহারা সমভূমি হইয়া শায়িত।

চিত্রগুপ্ত ছুটিয়া গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। ট্রামের পয়সার জন্য পকেটে হাত দিয়া দেখিল পকেট শূন্য, কোর্টের পকেট শূন্য, সার্টের পকেট শূন্য, ফতুয়ার পকেট শূন্য। 'সোমরসে' আসিবার সময়ে পকেটে টাকা-পয়সা ছিল। বুঝিল সাহিত্যিকদেরই এই কাজ। ধন্য তাহাদের শিক্ষা। একসঙ্গে পর-পর তিন জামার তিন দুগুণে ছয় পকেট কাটা সামান্য প্রতিভার লক্ষ .

৫

চিত্রগুপ্ত থিয়েটার দেখিবার জন্য টিকিট করিয়াছে, কিন্তু পথ ভুলিয়া থিয়েটারে ঢুকিতে রঙ্গদেশের আইন-পরিষদে গিয়া প্রবেশ করিল। সে দেখিল বিরাট প্রাসাদ, হাঁ রঙ্গদেশের যোগ্য থিয়েটার বটে। সুসজ্জিত আসনের একটাতে সে বসিল। দেখিল, রঙ্গমঞ্চে কাতারে কাতারে অভিনেতারা বসিয়া আছে, সাজ-সজ্জা দেখিয়া বুঝিল ইহারা সব কুরু-পাণ্ডব। ওই যে বিরাটকায় পুরুষ, উনি নিশ্চয় ভীম, আর ওই যে চাপকান-সমন্বিত পুরুষ উনি নিশ্চয় দুর্য্যোধন। মাঝখানে ঘাড়ে-গর্দ্দানে যে লোকটা বসিয়া সে নিশ্চয় ধৃতরাষ্ট্র। ওই যে একদিকে অতি ক্ষীণ-কায়া দ্রৌপদীকেও দেখা যাইতেছে। সে পরম আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময়ে দুর্য্যোধন উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—ভাই সব, আজ এই সভায় স্থির করিতে হইবে সূর্য্য পশ্চিমে ওঠে, না পূব দিকে ?

পাণ্ডবের দল ধিক্কার দিয়া উঠিল।

চিত্রগুপ্ত ভাবিল, এসব কথা তো মহাভারতে নাই। ভীম গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, প্রধান মন্ত্রী মহাশয়, আমি সহস্রবার সূর্য্যকে পূবে উঠিতে দেখিয়াছি। দুর্য্যোধন বলিলেন, আপনি দেখিলে কি হইবে ? পাণ্ডবের চোখকে কৌরবগণ বিশ্বাস করে না, কারণ তাহাদের চোখ মোহগ্রস্ত।

পাণ্ডবের দল হইতে বিরূপাক্ষ বলিয়া উঠিল, আর কৌরবের চোখ অন্ধ, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ—অন্ধের পুত্র অন্ধ।

দুর্য্যোধন বলিলেন, সভাপতি মহাশয়। বাপ তুলিয়া কথা বলা কি বে-আইনি নয় ?

সভাপতি উত্তর দিবার আগেই বিরূপাক্ষ বলিল—বাপ যদি বে-আইনি না হয় তবে তার উল্লেখ বে-আইনি হইবে কেন ?

পাণ্ডবের দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, একজন বলিল—শুনুন, শুনুন।

কৌরবের দল বলিল, ধিক্ ধিক্।

সভাপতি রায় দিলেন, বাপ বে-আইনি নয়, তাহার উল্লেখ বে-আইনি।

তখন দুর্য্যোধন বলিলেন, ভাই সব, বর্ত্তমান যুগে চোখের উপর বিশ্বাস নাই। আমরা ভোট দিয়া স্থির করিব সূর্য্য কোন্ দিকে ওঠে। আপনারা কি দেশের জন্য, দশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ডাল-ভাতের জন্য কৌরবের দিকে ভোট দিবেন না ? সূর্য্যের উদয় স্থির করিবার কি অধিকার পাণ্ডবদের আছে ? উহারা সংখ্যায় কম ; এ রাজ্য আমাদেরই, উহারা পুনরায় বনে যাক।

—তখন সভাগৃহের চারিদিক হইতে বিড়াল, কুকুর, গর্দ্দভ, বৃষভ, ছাগল, ভেড়া, মুরগী নানা জাতীয় পশুপক্ষী ডাকিয়া উঠিল।

সভাপতি বলিলেন, এ বিষয়ে তর্ক বৃথা। আপনারা ভোট দিবার জন্ত প্রস্তুত হোন।

ইহা শুনিয়া ভীম বলিয়া উঠিলেন, ভ্রাতৃগণ—তোমরা যদি পাণ্ডবের দিকে হও, যদি আত্মসম্মান থাকে, যদি সত্য বলিবার সাহস থাকে, যদি স্বচক্ষে কখনও সূর্য্যোদয় দেখিয়া থাক—তবে এস আমার সঙ্গে সভা ত্যাগ করিয়া বাহিরে এস।

ইহা শুনিয়া ভীমকে অনুসরণ করিয়া পাণ্ডব দলের অনেকে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু কৌরবের দল ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহারা হাত গুণিয়া স্থির করিল পশ্চিমে সূর্য্যোদয়ের পক্ষে ১৪৭ জন, আর পূবে সূর্য্যোদয়ের পক্ষে মাত্র ২৭ জন।

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, আজ হইতে রঙ্গদেশে পশ্চিমে সূর্য্যোদয় হইবে, ইহার বিপরীত কথা কেহ বলিলে—রঙ্গদেশের আইন অনুসারে সে দণ্ডনীয় হইবে। সভা ভঙ্গ হইল!

চিত্রগুপ্ত বাহির হইয়া আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিল—তাহার পাঁচ সিকা পয়সা সার্থক হইয়াছে, এমন সুন্দর অভিনয় দেখিবার আশা সে করে নাই।

৬

চিত্রগুপ্ত ট্রামে ফিরিতেছে, এমন সময়ে দেখিল এক ছোকরা হাঁকিতেছে, নিয়ে নিন বাবু, চার চার পয়সা, নূতন আইন—"গীতার হস্তান্তরবাদ," নিয়ে নিন্।

গীতায় হস্তান্তরবাদ! চিত্রগুপ্ত গীতায় জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে কিছু জানে! ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত চার পয়সা দিয়া একখানা বই কিনিয়া ফেলিল। বই পড়িয়া দেখিল—ব্যাপার আর কিছু নয়,

মহাজনকে কি ভাবে ফাঁকি দেওয়া যায়, নিজের সম্পত্তি কি ভাবে আইন-সঙ্গত উপায়ে বেনামী করা যায়, সেই সম্বন্ধে উদার সব আইন ইহাতে বিধিবদ্ধ। রঙ্গজাতি অত্যন্ত গীতাপরায়ণ, সেইজন্য গীতা হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া বুঝানো হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের গূঢ় মর্ম্ম কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞান-যোগ নয়—ঋণ-যোগ, ঋণীরা স্বভাবতই নিষ্কাম, অর্থাৎ ঋণশোধ করিবার ইচ্ছা তাহাদের থাকে না, কিন্তু অবুঝ মহাজনরা প্রায়ই নিষ্কাম হয় না—টাকা ফিরিয়া পাইবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করে। এক্ষণে তাহাদের নিষ্কামকর্ম্ম শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, মহাজনরা যাহাতে দায়বদ্ধ সম্পত্তি ধরিতে না পারে, তজ্জন্য সম্পত্তি কি ভাবে আইন বাঁচাইয়া হস্তান্তর করিতে হয় তাহার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—সংক্ষেপে ইহারই নাম "গীতার হস্তান্তরবাদ।"

চিত্রগুপ্ত ভাবিল, দেবতারা মিছা অপবাদ দেন যে ব্রহ্মা রঙ্গজাতির মাথার মধ্যে মস্তিষ্ক ভরিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহা যদি মস্তিষ্কের পরিচয় না হয় তবে আর কিসে মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যাইবে?

সে পার্শ্ববর্ত্তী আরোহীকে বলিল, মশায়, এই যে আইন, ইহা কি ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে?

সে লোকটা হাঁ করিয়া থাকিল, শুধাইল, 'ন্যায়' কাহাকে বলিতেছেন? রঙ্গদেশে ও কথা কখনও কেহ শোনে নাই!

চিত্রগুপ্ত অবাক! সে বলিল, সে কি মশায়, এ আইন তো ধর্ম্মসঙ্গত নয়।

—ধর্ম্ম? লোকটা আরও বেশী অবাক্ হইল। এমন সময়ে ট্রামের কণ্ডাক্টার আসিয়া তাহাকে বলিল, ট্রাম কোম্পানীর নিয়ম যে, ট্রামে কেহ অশ্লীল কথা বলিতে পারিবে না। আপনি হয় চুপ করুন, নয় নামিয়া যান।

ট্রামের সকল যাত্রী সমস্বরে বলিয়া উঠিল, কথা ঠিক ! ওরকম অশ্লীল কথা আমরা শুনিতে পারি না। কণ্ডাক্টার তাহাকে নামাইয়া দিল।

কয়েকজন লোক তাহার সঙ্গে নামিয়া পড়িল ; এবং 'ন্যায়', 'ধর্ম্ম' প্রভৃতি ভদ্রসমাজে অনুচ্চার্য্য অশ্লীল কথা বলিবার জন্য তাহাকে মারিতে গেল। চিত্রগুপ্ত প্রাণভয়ে ছুটিতে লাগিল। পথের সব লোক তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল, কেহ বলিল, শালা জার্ম্মানীর গুপ্তচর, কেহ বলিল, পঞ্চম বাহিনীর লোক, কেহ বলিল, শালা গান্ধীর চর, রুশদেশকে আর কিছুতেই জব্দ করিতে না পারিয়া এখন রক্তজাতির নীতিজ্ঞান মাটি করিতে আসিয়াছে।

প্রাণভয়ে ভীত চিত্রগুপ্ত জনতাকে বহুদূরে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল এবং সম্মুখে দেখিল এক বৃহৎ বাড়ী ; আত্মগোপন করিবার অভিপ্রায়ে সে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

চিত্রগুপ্ত ভাবিয়াছিল, এখানেও আশ্রয় পাইবে না, কিন্তু এই বাড়ীটার বাসিন্দাদের ব্যবহারে সে অবাক্ হইয়া গেল। তাহারা চিত্রগুপ্তকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইল, আশ্রয় দিল, আহার্য্য দিল, অভয় দিল, তাহাদের সৌজন্যে সে মুগ্ধ হইয়া গেল।

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, এমন ছুটিয়া এখানে প্রবেশ করিলেন কেন ?

চিত্রগুপ্ত সারাদিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলিল, ধর্ম্ম, ন্যায়, সত্য প্রভৃতি কথা উচ্চারণ করাতেই আমার এ দুর্দ্দশা। আপনারা কি ওসব কথা শোনেন নাই ?

তাহারা একবাক্যে বলিল, তাহাদের দুর্দ্দশার মূলে ওই সব কথা। তাহারা ন্যায়, ধর্ম্ম প্রভৃতি কথা বলিত বলিয়াই এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

চিত্রগুপ্ত শুধাইল, এ বাড়ীটা কি ?

তাহারা বলিল, ইহা পাগলা গারদ এবং আমরা পাগল।

চিত্রগুপ্ত বলিল, সে কি! এই রঙ্গদেশে আপনাদেরই তো কেবল প্রকৃতিস্থ বলিয়া মনে হইতেছে।

তাহারা বলিল, সে কথা ঠিক, কিন্তু আমরা সংখ্যায় কম। তবে শুনুন, পৃথিবীতে পাগল দুই জাতীয়—বদ্ধপাগল ও মুক্তপাগল। বদ্ধপাগলের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। মুক্তপাগল অসংখ্য। বদ্ধপাগলেরা গারদে থাকে, মুক্তপাগলেরা সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায়।

চিত্রগুপ্ত শুধাইল, আপনারা কতদিন এখানে থাকিবেন?

তাহারা বলিল, যতদিন না মুক্তপাগলের দলে যোগ দিই অর্থাৎ ধর্ম, ন্যায়, সত্য প্রভৃতি শব্দ কখনও যে শুনি নাই, ও সব পদার্থ যে রঙ্গদেশে নাই এ কথা যতদিন না স্বীকার করি।

চিত্রগুপ্ত বলিল, মহাশয়, যতদিন আমি রঙ্গদেশে থাকিব, আপনাদের আশ্রয়ে থাকিব, রঙ্গদেশে যদি ভদ্রলোকের স্থান থাকে তবে তাহা এই পাগলা গারদ।

*

চিত্রগুপ্ত রঙ্গদেশের পাগলা গারদে বসিয়া ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করিবার জন্য রিপোর্ট লিখিল। সে লিখিল, রঙ্গদেশে ভ্রমণ করিলাম। পিতামহ ব্রহ্মা যে ইহাদের মাথার খুলির মধ্যে বুদ্ধি দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন তাহা মনে হয় না, কারণ কোন কোন বিষয়ে ইহারা অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়া থাকে, যাহা স্বর্গের অনুকরণযোগ্য। তবে রঙ্গদেশ ভাল কি মন্দ, এক কথায় বলা সম্ভব নয়। বরঞ্চ বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইহা ভালও নয়, মন্দও নয়, ইহা অপূর্ব—অর্থাৎ রঙ্গদেশের কবির ভাষায়—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।"

এই দেশের সৃষ্টি ব্রহ্মার অসাধারণ কারু-কৌশলের পরিচয়। এ দেশ নষ্ট

হইয়া গেলে বিশ্ব হইতে একটা অদ্ভুত জিনিষ নষ্ট হইবে, কাজেই ইহাকে সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া রাখা আবশ্যক।

পুনশ্চ

এ দেশে যাহাতে তরুণ দেবতারা না আসিতে পারেন সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন; আসিলে তাঁহারা ফিরিতে চাহিবেন না; আমি বৃদ্ধ এক এক বার আমারই ফিরিতে অনিচ্ছা হইতেছিল, মাধ্যাকর্ষণের শক্তি এ দেশে অবাঞ্ছনীয় ভাবে প্রবল। ইতি—

মারণ-যজ্ঞ

তোমরা যাই বল না কেন—ইউরোপের মত এমন পরার্থপর দেশ আর নাই!

কেন?

কেন বুঝিবে কেমন করিয়া! নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ যাহারা করে নিজের গলা কাটিয়া পরের যাত্রায় আসর জমাইবার মর্য্যাদা তাহারা বুঝিবে কি করিয়া?

গত মহাযুদ্ধের কথা মনে আছে? যখন ইউরোপে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছিল তখন আমরা নিরাপদ দূরত্বে থাকিয়া বড় বড় মানচিত্র আর লাল নীল পিন কিনিয়া কোন্ পক্ষ কত দূর অগ্রসর হইল নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। ইউরোপের নদীনালা সহর গ্রাম পাহাড় পর্ব্বত তখন বেশ মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আমরা, ভারতীয়েরা, চিরদিনই ইতিহাসের চারআনার গ্যালারীর দর্শক, দূরে থাকিয়া দেখি, চানাচুর চিবাই, হাততালি দিই আর সংবাদপত্র পড়ি।

সেই হইতে সংবাদপত্র পড়িবার অভ্যাস ছাড়ি নাই—বরঞ্চ অন্যসব অভ্যাস ছাড়িয়াছি।

সত্য কথা বলিতে কি, আজকাল সংবাদপত্র ছাড়া আর কিছু পড়ি না। আবার সংবাদপত্রেরও সবটা নয়, কেবল বৈদেশিক সংবাদ আর পাটের বাজারের পূর্ব্বাভাষ! কবে যুদ্ধ বাধিবে আর কবে পাটের দর চড়িবে!

কেন?

আচ্ছা তবে খুলিয়া বলি। ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও পাট জন্মে? যুদ্ধ বাধিলেই পাটের দর চড়িবে—পাটের দর চড়িলেই বাঙ্গালী কৃষকের অবস্থা ভাল হইবে, তাহার অবস্থা ভাল হইলেই তোমারও ভাল!

যখন পরহিতের জন্য (কারণ আমার পাটের ক্ষেত নাই) প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ নন্দ-দা আসিয়া হাজির!

নন্দ-দা বলিলেন, ভায়া এবারে কাজ হাঁসিল! আমি তাঁহাকে বসিতে দিয়া বলিলাম—এক কাপ চা আনাই!

নন্দ-দা বলিলেন—যা করবে চট্‌পট! চা আসিল, নন্দ-দা চা পান করিতে লাগিলেন; এই অবসরে পাঠক তোমাকে তাঁহার পরিচয়টা দিই।

নন্দ-দার অবস্থা এক সময়ে খারাপ ছিল, তখন তিনি আমাদের দশজনের মতই সাধারণ লোক ছিলেন। তারপরে অবস্থা যখন ভাল হইল তখন তিনি অসাধারণ হইয়া উঠিলেন—অর্থাৎ রাতারাতি চাঁদনী হইতে একটা স্যুট ও প্রাচীনশাস্ত্র হইতে একটা ফিলজফি সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। এখন তিনি ঘোর বিশ্বপ্রেমিক!

বিশ্বপ্রেম কি?

যে ভাব মনে উদিত হইলে ঘরের পাশের প্রতিবেশীর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা না করিয়া ব্রেজিল ও বেলজিয়ামের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার ইচ্ছা হয়, সংক্ষেপে তাহাই বিশ্বপ্রেম।

এ হেন বিশ্বপ্রেমিক নন্দ-দা কিছুদিন হইতে জগতের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন! তাঁহার মতলবটা এই রকম— জগতের বর্ত্তমান দুঃখ দুর্দ্দশার মূলে axis power এর অত্যাচার। কোনরূপে এই axis বা অক্ষ ভাঙিতে পারিলে জগতে শান্তি আবার ফিরিয়া আসিবে। আর এই axis-এ আঘাত করিতে পারিলেই সব ঠাণ্ডা!

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত গত দুই বৎসর হইতে তিনি নানা রকম উপায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন।

প্রথমে তিনি জার্ম্মাণীযাত্রী একটি বাঙালী ছাত্রের সঙ্গে কিছু কচুরী পানার শিকড় দিয়াছিলেন। সেই শিকড় সেখানকার জলে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ক্রমে দেশটা কচুরী পানায় ছাইয়া ফেলিবে এবং কালক্রমে জার্ম্মাণী বাঙলাদেশ হইয়া উঠিবে! ব্যস।

কিন্তু জার্ম্মাণীতে প্রবেশের সময়ে শুল্কবিভাগের কর্ম্মচারী চালাকি ধরিয়া ফেলিল, কচুরিপানার শিকড় জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করিতে পারিল না এবং পরের দিন জার্ম্মাণীতে কচুরী অর্ডিনান্স প্রচারিত হইল!

কিন্তু নন্দ দা দমিবার পাত্র নহেন। কিছুদিন পরে তিনি কতকগুলি স্বপ্নাদ্য মাদুলী জার্ম্মাণীতে পাঠাইলেন—উদ্দেশ্য, এই মাদুলী ধারণ করিতে করিতে সে দেশের লোক ধর্ম্মভীরু ও অহিংস হইয়া উঠিবে। কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল। সে দেশের মেমসাহেবেরা মাদুলিগুলাকে 'ইণ্ডিয়ান অর্ণামেণ্টস্' মনে করিয়া তুষার-ধবল নিটোল বাহুতে পরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোনরূপ ফল ফলিল না। নন্দ-দা বলিলেন, ম্লেচ্ছের স্পর্শে ওষুধের গুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন আগে আসিয়া তিনি বলিয়াছিলে—ওহে এবার এক মতলব ঠাওরানো গিয়াছে—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি?

—শোন তবে! আমাদের নোট-সম্রাট মহাস্তিকে জান তো! তাঁকে পাঠাবো জার্মাণীতে! সে দেশের স্কুল কলেজের বইয়ের নোট লিখে, অর্থাৎ বাঘ মানে শার্দুল লিখে ছেলেগুলোর মাথা খেয়ে দেবেন। দেখ্‌বে এক generation-এর মধ্যে জার্মাণী বাঙলাদেশ হয়ে পড়বে! কিন্তু মুস্কিল কি জানো, মহাস্তি জার্মাণ জানে না, তাকে জার্মাণ শিখে নিতে বলেছি!

আজ নন্দ-দার আগমনে বুঝিলাম যে, সেই বিষয়ে কিছু পরামর্শ করিতে আসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে নন্দ-দার চা-পান শেষ হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি দাদা, মহাস্তি জার্মাণ শিখলো?

নন্দ-দা অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন—থোৎ, ওসব জার্মাণ টার্মাণের কাজ নয়। এবার আসল উপায়ের সন্ধান মিলেছে।

আমি জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া রহিলাম। তিনি গলা খাটো করিয়া বলিলেন—ঘরে কেউ নেই তো?

—দেখতেই পাচ্ছেন।

—বাইরে?

—সব সিনেমার অগ্রিম টিকিট কিনতে গিয়েছে।

—তবু একবার দেখে এসো।

বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিলাম।

তিনি বলিলেন—দরজায় এবার খিল এঁটে দাও।

দরজায় খিল দিলাম।

তিনি বলিলেন—কাছে এসো।

কাছে গেলাম।

গলা খাটো করিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিলেন—একজন মহাতান্ত্রিকের দেখা পেয়েছি—একেবারে সাক্ষাৎ অবধূত।

আমি মূঢ়ের মত বলিলাম—ব্যাপার কি?

—ব্যাপার আবার কি? আজ শনিবার, অমাবস্যা! রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে নৈঋতে যখন যোগিনী আস্‌বে, বাস্! বাছাধনের আর মস্কোতে যেতে হ'বে না!

তারপরে একটু থামিয়া নিঃসংশয় প্রমাণের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন—নৈঋত কোণে মস্কো কিনা, কি বল?

কি আর বলিব!

বলিলাম—আপনিই বলুন!

তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—উঁহু এখন নয়। স্বামীজীর নিষেধ! এই নাও ঠিকানা, রাত্রি দশটার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে—বিলম্ব করো না।

দেখিলাম দমদমের একবাগান বাড়ীর ঠিকানা!

নন্দ-দা এসব কথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে দমদমের বাগানবাড়ীতে পৌঁছিলাম, দ্বারদেশে নন্দ-দা অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু নন্দ-দার একি বিচিত্র বেশ! পরণে লাল চেলি, গায়ে লাল চাদর, গলায় রুদ্রাক্ষ, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, হাতে ত্রিশূল, পায়ে খড়ম, মুখে ব্যোম্ ব্যোম্ রব, চোখ দু'টাও যেন লাল!

আমি বলিলাম—নন্দ-দা একি!

তিনি বলিলেন—চুপ! সঙ্গে এসো।

সঙ্গে চলিলাম!

বৃহৎ একটি অট্টালিকা, যেমন নির্জ্জন তেমনি নিস্তব্ধ, তেমনি ভগ্নপ্রায়! আমি নন্দ দাকে অনুসরণ করিয়া দোতলায় উঠিতেছি। একটি কেরোসিনের ডিবে ক্ষীণ আলোদানের উপলক্ষ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার আমাবস্যা সৃষ্টি করিতেছে। স্বীকার করিতে লজ্জা নাই যে, আমি ভয় পাইলাম। নন্দ-দা কি শেষে বিপ্লবী হইল নাকি? না ভৌতিক কিছু—শেষের কথাটা বোধ হয় জোরেই বলিয়া ফেলিয়াছিলাম—

তিনি বলিলেন—অবধৌতিক।

তবে সেই যে সকালে বলিয়াছিলেন—একজন অবধূত মিলিয়াছে, এ বাড়ী বোধহয় তাহারই নিকেতন।

একটি বৃহৎ হলঘরে প্রবেশ করিলাম। নন্দ-দার মনে তবে এই ছিল! মনে হইল কপালকুণ্ডলার কাপালিকের আশ্রমটিকে আস্ত উঠাইয়া আনা হইয়াছে। মেঝেতে খান পাঁচছয় কুশাসন জোড়া দিয়া এক বিরাট অবধূত বসিয়া আছেন; তাঁহার ধুতি চাদর লাল, রক্তচন্দনে কপাল লাল, কিসের প্রভাবে চোখ দুটি লাল, পাশে একখানা ত্রিশূল পড়িয়া, হাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষের রাশি। সম্মুখে যজ্ঞের আয়োজন; বালি, পাটকাঠি, ঘৃত, বিল্বপত্র, খড়্গ, কোশাকুশি, ধূপদানী, ছিন্ন ছাগমুণ্ড এবং অদূরে কয়েকটি সন্দেহজনক বোতল। তবে কি আমিই নবকুমার! নন্দ-দার মনে শেষে এই ছিল। নন্দ-দা কানে কানে বলিলেন, বাবাজীকে প্রণাম কর।

প্রণাম করিলাম!

বাবাজী বলিলেন—বৈঠো বাচ্চা!

তবু ভাল—তিনি যে 'ভৈরবী প্রেরিতোহসি' বলেন নাই! বাবাজীর গলাতে একখানা তক্তির মত কবচও লক্ষ্য করিলাম!

তখনও সন্দেহ নিরসন হয় নাই—নবকুমারের কার্য্য যে আমাকে দিয়া হইবে না তখনো নিশ্চিত হই নাই—এমন সময় দেখিলাম অদূরে অস্পষ্ট আলোকে একখানা ছবি একটি কাষ্ঠফলকে আঁটিয়া রাখা হইয়াছে। সে ছবি হিটলারের! সদ্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে কাঁচি চালাইয়া কাটা! বুঝিলাম নন্দ-দার উদ্দেশ্য মহৎ!

নন্দ-দা বলিলেন, বাবাজী লগ্ন আসন্ন!

বাবাজী বলিলেন, বহুৎ আচ্ছা! থোড়া কারণ পান কর্ না!

নন্দ-দা একটি বোতল অগ্রসর করিয়া দিলেন, বাবাজী অকারণে

অনেকটা পরিমাণে পান করিয়া ফেরিলেন; খানিকটা প্রসাদ নন্দ-দাকে দিলেন, তিনি ভক্তিভরে পান করিলেন; আমার হাতেও খানিকটা দিলেন, আমি তাঁহাদের অগোচরে ফেলিয়া দিলাম।

এইবার বাবাজী হোম করিতে বসিলেন।

তান্ত্রিকমতে পূজা। শনিবার আমাবস্তার নিশীথরাত্রি!

বালু সাজাইয়া, চারিদিকে পাটকাঠি দিয়া, মাঝখানে প্রচুর পরিমাণে যজ্ঞডুমুরের সমিধ্ রক্ষা করিয়া বাবাজী যথাশাস্ত্র অগ্নি জ্বালিলেন, ঘৃত-নিষিক্ত অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তীব্র আলোকে ভয় পাইয়া ঘরের কড়িকাঠে নিবদ্ধ কয়েকটি চামচিকা ঘরময় ফড়ফড় করিয়া উড়িতে লাগিল। বাবাজী একখানি তালপাতার চণ্ডীজাতীয় পুঁথি হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমাগ্নিতে ঘৃতাসিক্ত বিল্বপত্র আহুতি দিতে লাগিলেন! ঘৃতের গন্ধে, অগ্নির তাপে, স্বধা প্রভৃতি মন্ত্রের শব্দে মুহূর্ত্ত মধ্যে বৈদিক কালে চলিয়া গেলাম। বাবাজী অগ্নিতে বিল্বপত্র দেন আর 'হর্য্যক্ষ'-দৃষ্টিতে (অর্থাৎ কট্‌মট্ করিয়া) হের হিটলারের দিকে তাকাইতে থাকেন! বেচারা হিটলার!

নন্দ-দা আমার কানের কাছে বসিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিতে থাকেন —বুঝলে না ভায়া, বাবাজীর প্রত্যেক কটাক্ষে পাষণ্ডটার বুকের রক্তে টান্ পড়ছে! এতক্ষণে খোঁজ নিয়ে দেখ ওর 'ব্লাড-প্রেশার' low হয়ে গেছে!

মূঢ় আমি বললাম—সে যে অনেক দূরে আছে।

নন্দ-দা একটি পৌরাণিক হাসি হাসিয়া বলিলেন, থাক্‌লোই বা! এযে তান্ত্রিক মন্ত্র।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য? হের হিটলারের নিধন! এই যজ্ঞের নাম মারণযজ্ঞ। দেখবে যখন আগুনে পূর্ণাহুতি পড়বে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বার্লিনে বাছাধন

চিৎপটাং! আর মস্কোতে প্রবেশ করতে হ'বে না। তার বদলে কাগজে দেখবে অকস্মাৎ হের হিটলার অ্যাপোপ্লেপি রোগে মৃত্যুমুখে পতিত।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নন্দ-দা খানিকটা থামিলেন, তারপরে যেন নিজের মনেই বলিলেন—অনেক চেষ্টায় বাবাজীর দেখা পেয়েছি। · বুঝলে ভায়া এই এক 'ষ্ট্রোকে' রোম-বার্লিন-টোকিও-এক্সিস ভঙ্গ হ'য়ে, বিশ্বে আবার শান্তি ফিরে আসবে।

নন্দ-দা পৃথিবী শব্দের পরিবর্ত্তে 'বিশ্ব' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ওদিকে যথাশাস্ত্র অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িতেছে, স্বাহা, স্বধা, ওঁ হ্রীং ক্রীং ধ্বনিত হইতেছে। আর চামচিকা ফড়ফড় করিয়া উড়িতেছে।

নন্দ-দা মাঝে মাঝে সন্দেহজনক বোতল অগ্রসর করিয়া দিতেছেন বাবাজী এই সমস্তের আদি কারণস্বরূপ কারণসলিল পান করিতেছেন।

বোধ হয় একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—হঠাৎ একটি হুঙ্কারে জাগিয়া উঠিয়া দেখি, বাবাজী বলিতেছেন—বাচ্চা পূর্ণাহুতি দেনাকা লগ্ন আ-গিয়া

বাবাজীর হিন্দী শুনিয়া বুঝিলাম রাষ্ট্রভাষা এখনো আয়ত্ত হয় নাই। তবে কিনা অকৃত্রিম সন্ন্যাসীরা প্রায়শঃই হিন্দুস্থানী, সেইজন্য তিনি হিন্দী বলিতে চেষ্টা করেন।

নন্দ-দা শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। একটি কুশিতে করিয়া ঘৃত, মন্ত্রপূত বিল্বপত্র লইয়া বাবাজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নন্দ-দা তাড়াতাড়ি হিটলারের ছবিখানা আনিয়া বাবাজীর হাতে দিলেন—এই বারে পূর্ণাহুতিসমেত ছবিখানা অগ্নিতে পড়িবে আর সঙ্গে সঙ্গে ছ' হাজার মাইল দূরে মস্কোর পথে পাবণ্ডটা হঠাৎ অ্যাপোপ্লেকসিতে…আঃ কি শাস্ত্রই না সনাতন ঋষিরা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন!

কিন্তু এমন সময়ে বাবাজী যে প্রশ্ন করিলেন সেজন্য আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না ইতিহাসেও তাহার উত্তর নাই।

বাবাজী যাহা বলিলেন বাঙ্গলায় তার অনুবাদ দিতেছি।

বাচ্চা হিটলারের গোত্র কি?

সর্ব্বনাশ! নন্দ-দা আমার দিকে, আমি তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলাম।

তিনি বলিলেন—তোমার তো ইতিহাসে অনার্স ছিল, কোথাও কিছু পাওনি!

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, না দাদা!

তিনি বলিলেন—বেটারা সব ফাঁকি দেয়

ভাবিলাম বলি—

গোত্র তার নাহি জানি, তাত, তবে, সে যে দ্বিজোত্তম, আর্য্য কুল জাত।

বাবাজী বলিলেন—গোত্র না বলিতে পারিলে ফল ফলিবে না।

শেষে কি তীরে আসিয়া তরী ডুবিবে! এতক্ষণের যত্নের ফলে সুরেনবাবুর্গে বোধ হয় 'ফিট' উঠিয়াছে। শেষে কি এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবে!

বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন—হিটলার কোন্ বংশসম্ভূত?

এবার আর আমাকে ঠকাইতে পারিলেন না—আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—আর্য্য! আর্য্য!

বাবাজী যেন খানিকটা আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু নন্দ-দা ক্ষেপিয়া গেল নাকি? তিনি হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—হয়েছে, হয়েছে!

—কি হ'ল নন্দ-দা?

—হবে আর কি? ভাগ্যিস সুনীতি চাটুজ্যের কাছে ভাষাতত্ত্ব পড়েছিলাম! হিটলারের পুরো নাম পেয়েছি।

—ব্যাপার কি?

—শ্রীহিট্‌লার শর্ম্মণঃ।

নন্দ-দা রুখিয়া উঠিলেন, কেন পাব না? শর্ম্মণ থেকেই জর্ম্মণ। বাবা গ্রীম্‌স্ ল'র কাছে চালাকি নয়!

নন্দ-দা তখন গ্রীম্‌স্ ল'-র গৌরবে উপস্থিত কার্য্য বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। তিনি তখন কেশরী হইতে কাইজার, দানব হইতে ড্যানিউব, বল্‌গা হইতে ভল্‌গা সাধিতেছেন।

বাকি সমস্যার সমাধান বাবাজী স্বয়ং করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন গোত্র জানা না থাকিলে 'যথা নাম-গোত্র' বলিলেও কাজ চলিবে! তবে আর কি চাই!

বাবাজী পূর্ণাহুতি ও ছবিখানা হাতে করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; সবটা বুঝিতে পারি নাই, খানিকটা বেশ বুঝিতে পারিলাম "রোম-বরুণালয়-তক্র-অক্ষভল্লার—জগদ্বিতায়—শনিবাসরে, অমাবস্যায়াং তিথৌ·· আর্য্যবংশসম্ভূতস্য যথানামগোত্রস্য শ্রীঅধলোপ হিত্‌লার শর্ম্মণঃ প্রাণনাশায় ইদম্ পূর্ণাহুতিং স্বাহা!"

পূর্ণাহুতি যজ্ঞাগ্নিতে পড়িল! বাস্, নুরেমবার্গে কাজ হইয়া গিয়াছে! বিশ্বে (পৃথিবীতে নয়) আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে!

কিন্তু পাশের ঘরে ওকি অশান্তি! ও কাহাদের ভারি জুতার তালে তালে মচ্ মচ্ আওয়াজ!

নন্দ-দার দিকে তাকাইলাম!

নন্দ-দা বলিলেন—খবর পেয়েছে।

—কাহারা?

—নাৎসী চর।

আমি বলিলাম কি আপদ্‌! এ যে ইংরেজের রাজত্ব!

নন্দ-দা বলিলেন—হোলে কি হয়? নাৎসীরা আমাদের ধরতে আস্‌ছে! পালাও!

উপদেশ ও উদাহরণের মধ্যে ছেদ রহিল না—নন্দ-দা সোজা দরজার দিকে ছুটিলেন! কিন্তু তৎক্ষণি দরজার গোড়া হইতে তীব্র টর্চ্চলাইটের ছটা ঘরের মধ্যে পড়িল।

এখন বুঝি জেলে যাইতে হয়!

দরজার কাছে জন চার পুলিশ ও জন চার উপরিতন কর্ম্মচারী!

তাহারা নন্দ-দাকে পাকড়াইয়াছে। নন্দ-দা বিড়ালের কবলে মুষিকের মত ছট্‌ ফট্‌ করিতেছেন।

ইতিমধ্যে বাবাজী কার্য্য হাসিল করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। সন্দেহজনক বোতলের একটায় হাত পড়ে নাই—তিনি সেটাকে মুখের সঙ্গে লাগাইয়া ঊর্দ্ধমুখী হইয়া আছেন—হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন রক্তাম্বর রুদ্রাক্ষভূষিত মহাদেবের নন্দী প্রাণপণে শিঙা ফুঁকিয়া প্রমথপালকে ডাকিতেছে!

একজন পুলিশ আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—ততক্ষণে আমার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমি বলিলাম—We are performing religious duty! no interference! দেখিলাম তাহারা সকলেই বাঙালী, তাই বাঙলায় সুরু করিলাম—কুইন্স প্রোক্লামেশন পড়েছি! ধর্ম্মে হাত দেবার অধিকার পুলিশের নেই!

আমার কথায় নন্দ-দারও সাহস ফিরিয়া আসিল।

তিনি বলিলেন, ঠিক কথা। আমিও পড়েছি 'সরল ভারতবর্ষের ইতিহাসে'—আমিও পড়েছি। পাতার referenceটা বলে দাও না হে!

আমি পত্রসংখ্যার কথা ভাবিতেছি—এমন সময়ে একজন কর্ম্মচারী

বাবাজীর মুখের উপরে আলোকচ্ছটা ফেলিলেন—তিনি তখনও অনন্যমনা হইয়া শিঙা ফুঁকিতেছিলেন।

সেই কর্ম্মচারী পকেট হইতে একখানা ছবি মিলাইয়া লইয়া সম্মতি জানাইল। এমন সময়ে বাবাজীর গলার সেই কবচখানা চোখে পড়াতে তাহারা সেখানকার উপরে আলো ফেলিয়া দেখিল তাহাতে বড় বড় করিয়া ইংরাজীতে লেখা আছে—27 M H.! ইহা দেখিয়া সেই কর্ম্মচারী বলিল, That's the man!

বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—ফেরারী নাকি? শেষ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম, ফেরারীই বটে—তবে পাগলা-গারদ হইতে!

বাবাজী সেখানকার আসামী—কিছুদিন আগে সরিয়া পড়িয়াছিলেন—খোঁজ চলিতেছিল—এতদিনে সন্ধান মিলিয়াছে।

বাবাজীকে টানিয়া লইয়া চলিল। তিনি সেই বোতলমুখী হইয়া রহিলেন বোতল আর নামাইলেন না। বুঝিলাম, এতক্ষণে স্বভাব ফিরিয়া পাইয়াছেন।

সে রাত্রি নন্দ-দা ও আমাকে হাজতবাস করিতে হইল। কুইন্স প্রোক্লামেশন বাঁচাইতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করায় বলিল—তোমারা যে পাগল নও তাহা প্রমাণ হয় নাই। তোমাদের মেণ্টাল অবজারভেশন ওয়ার্ডে রাখিতে হইবে।

যাহা হোক, বহু কষ্টে উদ্ধার পাইলাম। শুধু যে বাবাজী যথাস্থানে গিয়াছেন তাহা নয়, আমরাও প্রত্যেকে যথাস্থান পাইয়াছি! আমি কাগজের সাব-এডিটর, নন্দ-দা মফঃস্বলের কোন কলেজে মাষ্টারী করেন।

"সদা সত্যকথা কহিবে"

পাঠক, যার কপালে দুঃখ আছে সে ভোগ করিবে, তার তুমিই বা কি করিবে আর আমিই বা কি করিব। কত ছেলেই তো বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয়ভাগ পড়ে, কেহ তো এমন ভুল করে না—সকলেই তো সেই বিপদপূর্ণ উপদেশটাকে দিব্যি ডিঙাইয়া চলিয়া যায় এবং স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞানের বলে বোধোদয়ে পৌছিবার পূর্ব্বে ভুলিয়া যায়! কিন্তু কপালে যার দুঃখ আছে সে ওখানে আটকাইয়া যায়।

কোন্ বিপদের কথা বলিলাম বোধকরি বুঝিতে পার নাই। না পারিবারই কথা, কারণ কাণ্ডজ্ঞানের বলে বহুদিন আগেই নিশ্চয় সে উপদেশটা ভুলিয়া গিয়াছ। তবে একবার মনে করাইয়া দিই—দ্বিতীয় ভাগে আছে যে, 'সদা সত্য কথা কহিবে।' মনে পড়িয়াছে কি?

আজ যার কথা বলিতে যাইতেছি এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে সে ওই উপদেশটা ভুলিতে পারে নাই, ভুলিতে এক এক সময়ে তুমি আমিও পারিনা, যখন আর কেহ মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদের স্বার্থহানি ঘটায় তখন এক একবার বিদ্যুতের মত ধাঁ করিয়া কথাটা মনে পড়ে তখন বিষম নৈতিক ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি করিয়া বসি। ঠিক সে রকম কথা বলিতেছিনা। রামতনু ওই তার নাম, এই উপদেশে এমন বাধিয়া গিয়াছিল, যেমন বাধিয়া যায় দোদুল্যমান কোঁচার অগ্রভাগে তীক্ষ্ণসূচি চোরকাঁটা—চোখে দেখা যায় না, কিন্তু পা ফেলিবার তালে তালে খোঁচাইতে থাকে।

একদা প্রভাতে, সুপ্রভাত বলিতে পারি না, রামতনু পড়িল—"সদা সত্য কথা কহিবে।" সন্ধ্যার মধ্যেই ভুলিয়া যাইত—কিন্তু তার মাষ্টার

রামতনুর কাঁচা মনের উপরে এই গজালটাকে বারে বারে স্মৃতির হাতুড়ি ঠুকিয়া আচ্ছা করিয়া বসাইয়া দিল—ফলে হইল এই যে লক্ষ্মণের মত শক্তিশেলবিদ্ধ হইয়া সে জীবন পথে চলিতে আরম্ভ করিল—ঠিক লক্ষ্মণের মত বলিতে পারি না—লক্ষ্মণ মরিয়া বাঁচিয়াছিল—রামতনু বাঁচিতে বাঁচিতে শেষে একদিন মরিল—অনেক দিন পরে।

রামতনু জিজ্ঞাসা করিল—মাষ্টার মশাই, সদা সত্য কহিবে—এটা কি সত্য? মাষ্টার মশাই বড় একটিপ নস্য লইয়া বলিল—এ ছাড়া কোন সত্য নাই।

রামতনু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মাষ্টার মশাই, সত্য কথা বলিলে লোকে কি করে?

মাষ্টার মশাই মুখের মধ্যে খানিকটা দোক্তা ফেলিয়া দিয়া বলিল—লোকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান করে। মিথ্যাবাদিকে ঘৃণা করে। রামতনু ভাবিল কাল একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া দেখিতে হইবে।

পাঠক, আশা করি তুমি কখনও এ রকম পরীক্ষা করিবে না—যদিও সুযোগ দিনের মধ্যে অসংখ্যবার পাইবে।

পরদিন ইস্কুলে রামতনুর সুযোগ আসিল। ক্লাসের পিছনের বেঞ্চে বসিয়া একটা ছেলে মাটিতে পা ঘসিতেছিল—পণ্ডিত বহু বার চেষ্টা করিয়াও ধরিতে পারিল না। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল—কেহ বলিতে পার কে জুতা ঘসিতেছে? সকলে নীরব। রামতনু ভাবিল তবে কি এরা দ্বিতীয় ভাগ পড়ে নাই! সে বলিয়া উঠিল, পণ্ডিত মশাই—রমেশ।

রমেশ বড়লোকের ছেলে, তা'তে বলিষ্ঠ, ক্লাসের সকলেই তাকে ভয় ও ভক্তি করে। রামতনুর কথা শুনিয়া সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, না পণ্ডিত মশাই—রমেশ নয়, রামতনুই জুতা ঘসিয়াছে। তখন পণ্ডিত মশাই উঠিয়া আসিয়া রামতনুকে মিথ্যাবাদী বলিয়া উত্তম-রূপে প্রহার করিয়া ক্লাস হইতে বাহির করিয়া দিল। সে ক্লাসের বাহিরে

আসিয়া চোখ বুজিবার অবকাশে বারংবার জপ করিতে লাগিল, সদা সত্য কথা কহিবে। এমন সময়ে ক্লাস ছুটি হইল—ছেলেরা বাহিরে আসিয়া তাকে দেখিয়া ধরিয়া কিল, চড়, ঘুষি, লাথি, যে যা পারিল মারিল। রামতনু যতই বলে আমি সত্য কথা বলিয়াছি, ছেলেরা ততই তাকে বিদ্রূপ করিতে থাকে, কেবল বিদ্রূপ নয়, সঙ্গে কিল চড়ও থাকে।

রামতনু বাড়ী ফিরিবার পথে ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল। সত্য কথা বলিলে তার ফল তো এমন ভয়ানক হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ভাগে তো এমন লেখেনা। সেখানে তো সত্যবাদী গোপালকে সকলে খুব ভালবাসিত। আচ্ছা, মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। পাঠক, রামতনুর যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকিত, অর্থাৎ সে তোমার আমার মত 'স্মার্ট' বা 'ক্লেভার' হইত, তবে ইস্কুলের অভিজ্ঞতাই তার পক্ষে যথেষ্ট হইত—মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি আর হইত না—কিন্তু রামতনু তুমি আমি নয়—সে ক্ষণজন্মা পুরুষ—ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই তার জন্ম।

সে মাষ্টারকে ইস্কুলের অভিজ্ঞতা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমাকে মারিল কেন? মাষ্টার বলিল—পণ্ডিত তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়াই মারিয়াছে—সত্যবাদী জানিলে আদর করিত।

—কিন্তু ছেলেরা মারিল কেন? তারা তো জানিত আমি সত্য কথাই বলিয়াছি। মাষ্টার বলিল—মিথ্যাবাদীরা সত্যবাদীকে দেখিতে পারে না—তাই ঈর্ষাবশত মারিয়াছে।

পাঠক, রামতনুর মাষ্টারের যুক্তির অভাব হয় না। সত্য কথা বলিতে হইলে বলা উচিত ছিল, সুযোগ বুঝিয়া সত্যকথা বলিবে, বিপদ না থাকিলে এবং লাভের বা প্রশংসার আশা থাকিলে সদা সত্যকথা বলিবে। রামতনু দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতিজ্ঞা করিল সদা সত্যকথা কহিব। মূর্খ রামতনু!

পরদিন রামতনু বাপের সঙ্গে বাজারে গেল। তার পিতা মেছুনির নিকটে দশআনার মাছ কিনিয়া একটি টাকা দিল; মেছুনি ছয়আনা ফেরৎ দিতে গিয়া ভুল ক্রমে দুটি সিকি দিল। ভদ্রলোক সিকি দুটি ত্বরিতভাবে ট্যাকে গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি ছেলেকে বলিল—চল। মেছুনি ভুল বুঝিতে পারিয়া বলিল—বাবু পয়সা কি বেশি দিলাম? সে বলিল—না, না ঠিক আছে। সত্যবাদী রামতনু বলিয়া উঠিল—বাবা দুটো যে সিকি দিল! পিতা পুত্রের প্রতি চোখের ইঙ্গিত করিয়া বলিল—না গো তুমি একটি সিকি আর একটি দু'আনি দিয়েছ। মেছুনি আর একজনকে মাছ বেচিতে লাগিল, পিতা-পুত্র চলিয়া গেল। আড়ালে গিয়া পিতা বলিল—পাকা ছোকরা কোথাকার—বাপের উপরে কথা!

রামতনু বলিল— বাবা, দ্বিতীয়ভাগে আছে, সদা সত্যকথা কহিবে।

পিতা বলিল—আছে তো তোর কি হ'য়েছে? মাষ্টারে বুঝি এই সব শেখায়। দেখছি একবার তোর মাষ্টারকে!

বাড়ী গিয়া মাষ্টারকে পিতা সব কথা বলিল, মাষ্টার বলিল—দাঁড়ান আমি দেখছি। মাষ্টার রামতনুকে শাসন আরম্ভ করিল—অর্থাৎ একখানি বাঁশের কঞ্চি কয়েকবার তার পিঠে পড়িল।

রামতনু বলিল—তবে কি সত্যকথা বলিব না?

মাষ্টার বলিল—একশবার বলিবে, তাই বলিয়া পাত্রাপাত্র জ্ঞান নেই? বাপের উপরেও সত্যকথা। রামতনু বুঝিল সত্যকথা বলিতে হইলে পাত্র বিচার করিতে হইবে।

মাষ্টার ছাত্রের পিতাকে গিয়া বলিল—আজ্ঞে ও ছেলেমানুষ সব কথার অর্থ বুঝিতে পারে না—এবার ঠিক হইয়াছে। পিতা খুসী হইয়া বলিল—বেশ আজ হইতে তোমার দু'টাকা মাহিনা বাড়িল।

মাষ্টার বুঝিল হিসাব শুধু জটিলতর হইল। মাহিনা পাওনা হয় বটে,

কিন্তু কোনদিন পাওয়া যায়না। এতদিন দশ টাকার হিসাব রাখিত— এবার হইতে বারো টাকার হিসাব রাখিতে হইবে।

ক্রমে রামতনু ইস্কুল ছাড়িয়া কলেজে প্রবেশ করিল—কিন্তু বাল্য-কালের কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিল না। 'সদা সত্য কথা কহিবে' রূপ প্রাচীন উপদেশটা সিন্ধবাদের বৃদ্ধের মত স্কন্ধে চাপিয়া থাকিয়া তার নিশ্বাসরোধ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। যখনই সে সত্যকথা লইয়া কোন বিপদে পড়িত তখনই সে তার পুরাতন মাষ্টারের কাছে গিয়া উপদেশ চাহিত, মাষ্টার উপদেশ দিয়া বলিয়া দিত সত্যকথা বলিবার অভ্যাস ত্যাগ করিও না। ফলে হইল এই যে রামতনু ক্যারমের ঘুঁটির মত সংসারের চারিদিকের দেয়ালে ক্রমাগত মাথা ঠুকিয়া মরিতে লাগিল। মাষ্টার তাকে বলিয়া দিয়াছিল—সংসারে সত্যকথা বলিবার পুরস্কার যদি না-ই পাও, দুঃখ করিও না, মৃত্যুর পরে স্বর্গে গিয়া (সত্যবাদী স্বর্গ ছাড়া আর কোথায় যাইবে।) পুরস্কার পাইবে, এবং একদিন ঠিক ক্যরমের ঘুঁটির মতই চারিদিকের দেয়ালে রিবাউণ্ড হইতে হইতে হঠাৎ এক সময় নরম জালের ঝুলিটার মধ্যে গিয়া পড়িবে—সেই ত স্বর্গ।

রামতনু এই ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইল, মরিতে অবশ্য একদিন হইবে— সেইদিন আমার পোয়াবারো—মিথ্যাবাদীরা সেদিন সত্যই মরিবে।

কিন্তু মৃত্যু তো মেসের চাকর নয় যে ডাক দিলেই আসিবে। ইতিমধ্যে তাকে সংসারে আর দশজনের মত চলাফেরা করিতে হইল।

একদিন সে ট্রামে উঠিতে যাইতেছে এমন সময়ে দেখিতে পাইল একটা লোক এক ভদ্রলোকের পকেট হইতে টাকার থলিটা তুলিয়া লইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া পড়িয়া পকেটকাটা, পকেটকাটা ব'লয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। পকেটকাটা বিপদ দেখিয়া টাকার থলিটা চট করিয়া রামতনুর অলক্ষিতে তার পকেটে গুঁজিয়া দিয়া পকেট-কাটা পকেট-কাটা বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। ক্রমে লোক জুটিয়া

গেল—সেই ভদ্রলোকও আসিল। বীটের পুলিশ যখন দেখিল ছোরা-ছুরি নয়, টাকার ব্যাপার, তখন সে ছুটিয়া আসিয়া দুইজনকে ধরিল।

রামতনু বলিল—এই লোকটা পকেট কাটিয়াছে।

সে লোকটা বলিল—ওই কাটিয়াছে মাইরি। জমাদার সাহেব পকেট সার্চ করিয়া দেখ। পুলিশ রামতনুর পকেট হইতে টাকার থলি টানিয়া বাহির করিয়া নিজের পকেটে রাখিল এবং তাকে টানিয়া থানায় লইয়া গেল।

বিচারে রামতনুর চারিমাসের সশ্রম কারাদণ্ড হইল। বিচারের সময়ে সে দ্বিতীয়ভাগ দেখাইয়া বিচারককে বলিয়াছিল—সে সদা সত্য কথা বলে। তার কথা শুনিয়া আদালতসুদ্ধ হাসিয়া উঠিল। বিচারক হাসে নাই বটে—কিন্তু রায় লিখিয়া তাকে জেলে পাঠাইয়া দিল।

পাঠক, রামতনু তোমার আমার মত সাধারণ লোক হইলে চার মাস পরেই বাহির হইতে পারিত কিম্বা বোধকরি জেলেই যাইত না। কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তার জন্মগ্রহণ। জেলের মধ্যে সত্যকথা বলিতে গিয়া কয়েদী, ওয়ার্ডার, জেলার, সুপার সকলের কাছে তাড়া খাইতে লাগিল এবং সত্যকথার অপ-প্রয়োগের জন্য চার মাসের স্থানে আট মাস মেয়াদ খাটিয়া একদিন প্রভাতে (রামতনুর পক্ষে সুপ্রভাত নয়) বাহির হইয়া আসিল।

জেল হইতে বাহির হইয়া রামতনু বুঝিল সংসারে অধিকাংশ লোকই বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয়ভাগ পড়ে নাই—নতুবা তারা এমন মিথ্যাবাদী কেন। সে স্থির করিল বাকি জীবনটা সে দ্বিতীয়ভাগের এই অদ্বিতীয় বাণী প্রচার করিয়া কাটাইয়া দিবে। সে দুইখানি পেষ্টবোর্ডে বড় বড় "সদা সত্যকথা কহিবে" লিখিয়া গলায় ও পিঠে ঝুলাইয়া দিয়া কলিকাতার রাজপথে বাহির হইল—এবং অনুমান করিল তার এই নৈতিক উদাহরণ (দুঃসাহস ?) অচিরে কলিকাতার চৌদ্দলক্ষ লোককে সত্যবাদী করিয়া

তুলিবে। কিন্তু ঠিক যেমনটি ভাবিয়াছিল—তেমনটি হইল না। পথে ছেলেরা ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল—যুবকেরা ঠাট্টা করিতে লাগিল—বুড়োরা অনুকম্পা করিয়া বলিল—লোকটা পাগল। প্রথমে কয়েকদিন এইভাবে চলিল—শেষে লোকের সমালোচনা কঠোরমূর্ত্তি ধারণ করিল।

বুর্জ্জোয়াগণ ভাবিল—লোকটা কম্যুনিষ্ট।

কম্যুনিষ্টগণ ভাবিল—লোকটা বুর্জ্জোয়া নহিলে এমন পুরাতন কথা বলিবে কেন ?

কংগ্রেসওয়ালারা ভাবিল—লোকটা লীগের টাকা খাইয়াছে।

লীগওয়ালারা ভাবিল—লোকটা কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ার।

আন্তর্জ্জাতিকবাদীরা ভাবিল—লোকটা সাভারকরের চর কি স্বয়ং সাভারকরও হইতে পারে।

হিন্দুসভাওয়ালারা ভাবিল—আমাদের শাস্ত্রে কোথাও তো এমন কথা নাই—লোকটা মূর্খ!

জার্ণালিষ্টরা ভাবিল—লোকটা পরশ্রীকাতর—আমাদের ব্যবসা নষ্ট করিবে।

সাহিত্যিকেরা ভাবিল—আমরা এতজন থাকিতে একটা লোকে দেশের মত বদলাইতে পারিবে না।

ব্যবসায়ীরা ভাবিল—লোকটা বেকার, বেকারগণ ভাবিল—ব্যাটা এই উপায়ে দু'পয়সা করিতেছে।

ক্যাপিটালিষ্টরা ভাবিল—লোকটা শ্রমিক। শ্রমিকরা ভাবিল—বেটা ক্যাপিট্যালিষ্টদের লোক।

প্রফেসারগণ ভাবিল—আমাদের এতদিনের শিক্ষা ছেলেরা একদিনে ভুলিবে না। মাষ্টারগণ কিছু ভাবিল না—শুধু একবার হাসিল।

আর পুলিশে ভাবিল—বেটা বিশেষ করিয়া তাদেরই ঠাট্টা করিতেছে।

তখন সকলে মিলিয়া একদিন রামতনুকে কলেজ স্কোয়ারে পাকড়াও

করিল এবং সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি? রামতনু কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া বলিল—আমি রামতনু।

তখন সকলের ভয় কাটিল—তারা পুনরায় সমস্বরে বলিল—লোকটা পাগল! ফলে রামতনু পাগল সাব্যস্ত হইয়া রাঁচির পাগলাগারদে গবর্ণমেন্ট খরচে প্রেরিত হইল।

পাগলাগারদে গিয়া রামতনু ভ্রাতৃপাগলগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ভাই সব, সদা সত্যকথা কহিবে। ভ্রাতৃপাগলগণ একস্বরে বলিল—ওটা পুরাতন কথা—নতুবা আমরা এখানে আসিলাম কি করিয়া!

রামতনু এবার মনের মত সঙ্গী পাইল—এতগুলি সত্যবাদী যে পৃথিবীতে আছে তা সে কখনো কল্পনা করিতে পারে নাই। সে মনের আনন্দে সদা সত্যকথা বলিতে লাগিল—এবং তৎপরিবর্ত্তে শালা, পাজি চোর, জোচ্চোর প্রভৃতি সত্যকথা শুনিতে লাগিল!

অবশেষে একদিন, দীর্ঘকাল পরে, সত্যকথা বলিতে বলিতে এবং শুনিতে শুনিতে রামতনু মরিল।

স্বর্গে গিয়া স্বর্গের দপ্তরখানায় উপস্থিত হইয়া চিত্রগুপ্তকে নিজের পরিচয় দিল—আমি সত্যবাদী রামতনু। চিত্রগুপ্ত বলিল—ওঃ বুঝেছি। এই বলিয়া তার দিকে একখানা টুল আগাইয়া দিল। রামতনু বলিল—পৃথিবীতে অনেক ভুগিয়াছি এবার এখানে কি পুরস্কারের বরাদ্দ আছে দেখি।

চিত্রগুপ্ত লেজার বুক্-এ রামতনুর হিসাবের পাতা খুলিয়া দেখিল—এবং দেখাইল! রামতনুকে উচ্চৈঃশ্রবার লেজে বাঁধিয়া স্বর্গ ঘুরাইতে হইবে—নীচে স্বয়ং ধর্ম্মরাজের স্বাক্ষর। বিস্মিত রামতনু বলিল—এ কি রকম পুরস্কার! চিত্রগুপ্ত বলিল—এটা পুরস্কার নয়, দণ্ড!

দণ্ড? কিসের? সত্যকথা বলিবার?

চিত্রগুপ্ত বলিল—না নির্ব্বুদ্ধিতার।—

নির্ব্বুদ্ধিতা? ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না।

চিত্রগুপ্ত বলিল—পারিবে না তা জানি। তুমি যে নির্ব্বোধ। আমরা কি আর মিছা দণ্ড বিধান করি।

রামতনু বলিল—বুঝাইয়া দাও।

চিত্রগুপ্ত বুঝাইতে লাগিল—পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় অপরাধ নির্ব্বুদ্ধিতা—স্মার্টনেস্ বা ক্লেভারনেসের অভাব। তুমি তার চরম দৃষ্টান্ত। এই বিধান তুমি যত রকমে ভঙ্গ করিয়াছ এমন কেহ করে নাই।

রামতনু বলিল—নির্ব্বুদ্ধিতা কিসের? আমি সদা সত্যকথা বলিয়াছি!

চিত্রগুপ্ত হাসিয়া বলিল—ওটাই তো নির্ব্বুদ্ধিতার চরম।

রামতনু বিরক্তির সঙ্গে বলিল—তবে ওরকম একটা উপদেশ পুঁথিতে থাকে কেন?

চিত্রগুপ্ত বলিল কে নির্ব্বোধ—আর কে বুদ্ধিমান্ পরীক্ষার জন্ম ও রকম দু'একটা উপদেশের বাধা আমরা সৃষ্টি করিয়া থাকি। মানুষ মাত্রেই তো ওটা পড়ে—কেউ তো তোমার মত ওটাকে সত্য বলিয়া মনে করে না।

ততক্ষণে উচ্চৈঃশ্রবা দরজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়া চিঁহি রব ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

রামতনু জিজ্ঞাসা করিল—আমার মাষ্টার মহাশয়েরও সবে এই দণ্ড হইবে?

চিত্রগুপ্ত বলিল—না তাঁর অক্ষয় স্বর্গ।

রামতনু বলিল—সে কি? তিনি কি তবে সত্যবাদী নহেন?

চিত্রগুপ্ত ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল—ঠোঁটের ফাঁক দিয়া তার সোনা বাঁধা দাঁত দুটি দেখা গেল—বলিল—না, যে "সদা সত্যকথা কহিবে" উপদেশ দেয়—তার মত মিথ্যাবাদী আর কে আছে? সে খুব ক্লেভার।

তোমার মাষ্টার—আমাদের চর। শুধু তোমার মাষ্টার নয়—মাষ্টার ও প্রফেসারগণ আমাদের গুপ্তচর, যাকে বলে এজেণ্ট প্রভোকেটর।

এখন সত্যবাদী নির্ব্বোধ রামতনু উচ্চৈঃশ্রবার লেজে বদ্ধহইয়া হেটমুণ্ড হইয়া স্বর্গ পরিভ্রমণ করিতেছে। মাঝে মাঝে পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া মিথ্যাবাদী ক্রেভার পৃথিবীর লোককে ধিক্কার দিতেছে—বোধহয় এখনও তার ভুল ভাঙে নাই। সে স্থির করিয়াছে মেয়াদ ফুরাইলে একবার স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে আপীল কবিবে। কিন্তু মূর্খ জানে না যে অনেক সময়ে আপীলে দণ্ড বাড়িয়া যায়। কিন্তু সে ভয় নাই—কারণ রামতনুর দণ্ড আজীবন। ভাষা ঠিক হইল না, জীবন তো তার শেষ হইয়াছে—যতদিন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে আর তার আত্মা থাকিবে ততদিন সে অশ্বচক্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে।

ব্রহ্মা নিশ্চিন্ত! তুমিও নিশ্চিন্ত হইতে পার—সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া আর তোমার ক্রেভারনেলে বাধা দিতে আসিবে না।

ইহা ফাঁকা গল্প নয়—নীতিমূলক গল্প। সে নীতিটি এই যে, তাক্ বুঝিয়া সত্যকথা বলিতে পারিলে পৃথিবীতে সম্মান ঐশ্বর্য্য পাইবে আর মৃত্যুর পরে অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া ইচ্ছামত পারিজাতের বনে উর্ব্বশী রম্ভাদের লইয়া পিকনিক করিতে পারিবে—তবে মাঝে মাঝে উচ্চৈঃশ্রবার লেজে বদ্ধ রামতনু ঘুরিতে ঘুরিতে কাছে আসিয়া পড়িলে, যদি লজ্জাবোধ হয়, উর্ব্বশীর আঁচলে মুখ লুকাইও।

ভূতের গল্প

আজ একটা ভূতের গল্প বলিব—একেবারে নিছক সত্য ঘটনা। আমি নিজে দেখিয়াছি কি না, জানিতে চাও? নিজে না দেখিলেও এক রকম দেখাই; পাড়ার ঘটনা, বন্ধুবান্ধব দেখিয়াছে, ঘটনার ঠিক পরেই তারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই দেখা ছাড়া আর কি?

আমাদের পাড়াতে একটা বাড়ীকে লোকে ভূতের বাড়ী বলিত। ছেলেবয়সে বাড়ীটাতে ভাড়াটে থাকিতে দেখিয়াছি, কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনিলাম বাড়ীটাতে নাকি ভূতের উৎপাত হইয়াছে। ভাড়াটে আসে না, আসিলেও থাকিতে পারে না, ভূতের উৎপাতে দু-চার দিন পরেই উঠিয়া যায়। শেষে আর ভাড়াটে জোটে না, 'টু লেট্' লেখা কাঠের তক্তা সারা বছর মাদুলীর মত বাড়ীর গায়ে বাতাসে দুলিতে থাকে। প্রকাণ্ড বাড়ী—এই সস্তার বাজারেও আশী টাকা ভাড়া নিশ্চয় হইত।

বাড়ীটাতে নাকি ব্রহ্মদৈত্য থাকে। উৎপাত আর কিছু নয়, মাঝ রাতে হাওয়া নাই, বাতাস নাই, হঠাৎ দরজা জানালা সব একসঙ্গে খুলিয়া গেল। উঠিয়া দরজা-জানালা দিয়া শোও, আবার খুলিয়া যাইবে। গরমের রাতে দরজা-জানালা খুলিয়া ঘুমাও, হঠাৎ সব বন্ধ হইবার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া যাইবে।

মাঝ রাতে বিদ্যুতের আলোগুলা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কিম্বা হয়তো সব আলো সকসঙ্গে নিভিয়া গেল। বেশি রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গিয়া শুনিতে পাইবে ছাদের উপরে কে যেন খড়ম পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; গ্রহণে বা ঐ জাতীয় কোন যোগ উপলক্ষে

অনেকে গভীর রাতে ছাদের উপরে সংস্কৃত মন্ত্রের আবৃত্তি শুনিয়াছে—স্বর ঈষৎ অনুনাসিক। লোকে প্রথমে মনে করিত ব্যাপার আর কিছু নয়—দুষ্টলোকের উপদ্রব, পাড়ার ছেলেরা পাহারা বসাইল, পুলিশে পাহারা দিল, কিন্তু এ সব উপদ্রব কমিল না।

তখন বাড়ীর মালিক রিষড়ার বিখ্যাত ভূতের ওঝাকে ডাকিয়া আনিল; সে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা ঘর বন্ধ করিয়া কি করিল জানি না, বাহির হইয়া আসিলে জানা গেল চোর-বাটপাড় কিছু নয়, ব্রহ্মদৈত্য ভর করিয়াছে। কথাটা দেখিতে দেখিতে পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া গেল, বাড়ীতে ভাড়াটে আসা বন্ধ হইল, আর ব্রহ্মদৈত্য পরম সুখে সেখানে কালযাপন করিতে লাগিল। এসব আমাদের অল্প বয়সের কথা, তারপরে সেই ভূতের বাড়ীর অস্তিত্ব সকলে একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল, হঠাৎ কি করিয়া এই বাড়ীর প্রসঙ্গ উঠিল, সেই কথাই আজ বলিব।

২

হঠাৎ একদিন মুঙ্গের হইতে রাম-দা আসিয়া উপস্থিত। রাম-দা'র পরিচয় কি দিব ভাবিতেছি, আমরা পাড়াশুদ্ধ সকলে তাঁকে মুঙ্গেরের রাম-দা বলিয়া জানিতাম, পরিচয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। এত বড় বিরাট পুরুষ আমি কখনো দেখি নাই—যেন রামায়ণ-মহাভারতের একটা বীরপুরুষ পথ ভুলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

এহেন রাম-দা'র জীবনে দুটি আসক্তি ছিল, তিনি ভূতে বিশ্বাস করিতেন না। ভূত দেখিবার আশায় তিনি যে কত শ্মশানে, কত পোড়ো বাড়ীতে, কত অমাবস্যার রাত্রিতে ঘুরিয়াছেন তার হিসাব নাই। আর কবিতা পড়িবার জন্য নূতন বই সংগ্রহ করিতে তিনি যে কত লাইব্রেরী, কত দোকান, কত কবির বাড়ী ঘুরিয়াছেন, তারও হিসাব অপরে জানে

না। রাম-দা ইংরেজী ভাল জানিতেন না, বাংলা কবিতাই বেশি পড়িতেন।

রাম-দা আমার বাসায় আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন ওহে—সাহিত্যিক, (আমি একজন সাহিত্যিকের পাশের বাড়ীতে থাকিতাম বলিয়া তিনি আমাকে সাহিত্যিক বলিতেন) নূতন কবিতার বই কিছু দাও! তাঁর জন্তে আমি আগেই এক বোঝা বাংলা কবিতা বই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম, বিরাট কাব্য-গন্ধমাদনটিকে অনায়াসে কুক্ষিগত করিয়া যখন তিনি উঠিতেছেন, শুধাইলাম—রাম দা, ভূতের দেখা মিল্‌ল?

পুঁথিয়া বোঝাটা ধপ্ করিয়া তক্তপোষের উপরে ফেলিয়া বলিলেন—যা নেই তার দেখা মিলবে কি ক'রে?—এই বলিয়া নিজের আধুনিকতম ভৌতিক এড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী বিবৃত করিলেন। গল্প শেষ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—না হে, ও জিনিষ নেই।

আমার পাশেই রমেশ বসিয়াছিল, সে একরকম পুরাতাত্ত্বিক, অর্থাৎ পুরানো বাড়ীর দালাল, সে বলিল—রাম-দা, এ পাড়ায় একটা ভূতের বাড়ী আছে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমার দিকে তাকাইয়া বলিল—সেই ঘোষেদের তেতালা বাড়ীটার কথা বলেছি হে।

পূর্ব্বোক্ত পুরাতন ভূতের বাড়ীর কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। আমি বলিলাম—হাঁ, ওটাতে ভূতের উপদ্রব আছে শুনেছি!

রাম-দা'র মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—ভূত আছে এ বিশ্বাসে নয়, একটা এড্‌ভেঞ্চার জুটিল এই আশায়।

তিনি বলিলেন—চল হে যাওয়া যাক্।

আমাদের মধ্যে যতীন ডিটেক্‌টিভ, কারণ রহস্য-পিরামিড সিরিজের ১৫২-খানা বই পড়িয়া ফেলিয়াছে; সে বলিল—রাম-দা, রাত ছাড়া তো সুবিধে হবে না।

রাম-দা বলিলেন—যা দিনেও নেই, তা রাতেও নেই। বেশ রাতেই যাবো। বাড়ী-ওয়ালা'কে ব'লে রাতটা সেখানে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

রমেশ বাড়ী-অলার অনুমতি আনিতে গেল, আর যতীন টর্চ-বাতি, চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য উদ্যোগী হইল। তারা রাম দার সঙ্গে ঐ বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিবে।

রাম-দা বলিলেন—রাতটা জাগতে হবে, আমি একটু ঘুমিয়ে নিইগে।

তারপরে বলিলেন—যাক্ ভালই হ'ল—রাতটা যখন জাগতে হবে, নূতন কবিতার বইগুলো পড়ে ফেলা যাবে। কি বল?

বলিলাম ভালই হবে।

রাম-দা রাত্রির ঘুম আগাম ঘুমাইয়া লইবার জন্য বাসায় রওনা হইলেন।

৩

রাত্রে আহারান্তে রাম-দা দলবল লইয়া ঘোষেদের ভূতের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। দোতালার হলঘরটি আগেই পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেখানে শতরঞ্চি বিছাইয়া সকলে শুইয়া পড়িল। পোড়ো বাড়ীতে আর বিদ্যুতের আলো কে রাখে? গোটা দুই হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতে থাকিল, বিপদের জন্য গোটা কয়েক টর্চবাতি আনা হইয়াছিল।

রাত্রি বারটার মধ্যে বার কয়েক চা হইলেও ঘুমে চোখের পাতা ভার হইয়া আসিতেছিল।

রমেশ বলিল—রাম-দা, ঘুম পাচ্ছে যে!

যতীন বলিল—রাম-দা, কবিতাই যখন পড়ছ, উচ্চস্বরে পড়ো, আমরাও শুনি।

রাম-দা বাংলা কবিতার বোঝা সঙ্গে আনিয়াছিলেন; তিনি এতক্ষণ একমনে পড়িতেছিলেন, এবারে মুখ তুলিয়া বলিলেন—এসব কি তোমাদের ভাল লাগবে?

বল কি? আসন্ন ভূতের ভয়ের সম্মুখে বাংলা কবিতা মনোরম লাগবে না, বাংলা সাহিত্যের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা আমার নেই।

রাম-দা স্বগতভাবে বলিলেন—যা বল, আজকালকার কবিরা খাসা লিখছে হে।

—পড়ুন, রাম-দা, পড়ুন। কবিতা শোনবার এমন পরিপূর্ণ অবসর দুর্লভ।

—ভূত, না ছাই। এই দেখ না রাত একটা।—একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া রাম-দা এই কথাগুলি বলিলেন। তারপরে সকলের আগ্রহাতিশয্যে পড়িতে লাগিলেন—শোন তবে, এই দেখ, ঈগল পাখীর উপরে কি সুন্দর কবিতা!

"অধৈর্য্যের তপস্যার নৈরাজ্য বিলাসে
তপশ্চর মহীয়ান্!
দুন্দুভি, দামামা!
হোরা, অক্ষ, দ্রাঘিমা, লঘিমা,
ঈডিপাস্ বিষম কম্‌প্লেকস্।"

চমৎকার! চমৎকার!—রাম-দা নিজেই উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এইবারে দেখ—ঈগল আর সাপে যুদ্ধ হচ্ছে!

"পীগম্যালিয়ন রম্ভা আর
সুন্দরী মেনকা।

মৈনাক কৈ নাক দম্ভ
ফুৎকার চীৎকার !
অন্ধ হ'ল রন্ধ্র তব।
মার্ক্‌স্‌ কই আলো ?
লেনিন লণ্ঠন জ্বালো।
মধ্যবিত্ত হাসি আর অশ্রু আভিজাত্য।
তাজমহলের গম্বুজ
দা-ভিঞ্চির তুলি,
হুইটম্যানের দাড়ি,
"পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ"
... ... — — ? ? ... ! ! —, —
মিলিয়নের মিলেনিয়াম।
সাপ আর ঈগল।"
—কি হে, ঘুমোলে নাকি ?

রমেশ বলিল—কি যে বল রাম-দা। এমন কবিতা শুনলে স্বয়ং কুলকুণ্ডলিনী জেগে ওঠেন, আর আমরা ঘুমোব ?

রাম-দা বলিলেন—ওয়াণ্ডারফুল !

যতীন সঙ্কোচে বলিল—অর্থ বোঝা কঠিন।

—কিছু কঠিন নয়। তোমাদের মধ্যবিত্ত সংস্কার ত্যাগ করলেই বুঝ্‌তে পারবে।—এই বলিয়া রাম-দা সেই সরল ও সরস কবিতা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।

এমন সময়ে হঠাৎ হলের দরজা জানালা খুলিয়া গেল। সকলে লাফাইয়া উঠিল, ব্যাপার কি ? বাতাস নাই, ঝড় নাই, জানালা খুলিল কেমন করিয়া ? কবিতা পাঠে বাধা পাইয়া রাম-দা বিরক্ত হইলেন;

উঠিয়া দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বসিয়া আবার কবিতা পাঠ আরম্ভ করিলেন—চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে আধুনিক বাংলার সেই শ্রেষ্ঠ কবিতাটি।

"কীটদষ্ট চক্রবাক্
উন্মোচিত, হে বাচাল,
জনতা সঙ্ঘাতে তব অসূর্য্য মাতে।
পোস্ট-কার্ড আর খাম
বেড়েছে তার দাম।
বেশি দিন নয় আর
আসছে লাল দানব
ওই শোনা যায় হুঙ্কার
ইনক্লাব জিন্দাবাদ!
স্বেচ্ছাচারী ট্রাম
ক্রতুকৃতমের শেষ
আকাশের চাঁদ, আর এরোপ্লেন
বোমা আর শিলাবৃষ্টি
অজবন্ধু মাতরিশ্বা
ট্রয়, দিল্লী, ব্যাবিলন।"

আবার সশব্দে দরজা-জানলা খুলিয়া গেল। ব্যাপার কি?

এমন সময়ে সকলে দেখিল অতি বিরাট ও অতি কুৎসিত এক পুরুষ ঘরে ঢুকিতেছে। পায়ে তার খড়ম, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, খাটো একখানা কাপড় পরণে, কাঁধে গামছা। রমেশ ও যতীন রাম-দা'র পিছনে গিয়া লুকাইল।

রাম-দা শুধাইলেন—মশায় কে?

কিন্তু সেই পুরুষ তার উত্তর না দিয়া অত্যন্ত করুণভাবে বলিল—

আপনারা আমাকে আর কষ্ট দেবেন না, ছেড়ে দিন।—লোকটার স্বর ঈষৎ অনুনাসিক।

রাম-দা শুধাইলেন—আপনি কে?

—আজ্ঞে আমি এই বাড়ীতে থাকি।

রাম-দা বলিলেন—এতক্ষণ দেখিনি কেন?

—আজ্ঞে পাশের বেল গাছটার উপরে বসে' হাওয়া খাচ্ছিলাম।

রাম-দা—আপনি কি?

—আজ্ঞে হাঁ, আপনারা যাকে ব্রহ্মদৈত্য বলেন আমি সেই।

রমেশ ও যতীন গোঁ গোঁ করিয়া মূর্চ্ছা গেল।

রাম-দা বলিলেন—আপনি যেখানে খুশী বসে হাওয়া খান, কিন্তু এখানে কেন?

—আজ্ঞে আমাকে আর কষ্ট দেবেন না।

রাম-দা বলিলেন—কষ্ট দিলাম কোথায়?

সে বলিল—ওই যে ভূত তাড়াবার মন্ত্র পড়ছিলেন, ওতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

রাম-দা বলিলেন—ভূতের মন্ত্র কোথায় পেলেন? এ তো কবিতা, আধুনিক কবিতা!

সে বলিল—আজ্ঞে ভূতের মন্ত্র তো কবিতাতেই লেখা হয়।

তারপর সে বইয়ের গাদা দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। বলিল—সর্ব্বনাশ। ভূতের মন্ত্রের এতগুলো বই ছাপা হয়েছে! আমি হচ্ছি নবাব আলীবর্দ্দীর সময়ের ভূত। তখনকার দিনে ভূতের ওঝা ছিল লালগোলার হোসেন মিঞা। সে আর কটা মন্ত্র জানতো?

রাম-দা বলিলেন—এ যে ভূতের মন্ত্র তা কে বললে?

লোকটা বলিল—আমি নিজে ভূত, আমি বলছি। আপনার প্রত্যেকটি শ্লোক তপ্ত লোহার মত আমার গায়ে বিঁধছিল। কিছুকাল আগে এই

বাড়ীর মালিক রিষড়ে থেকে ওঝা এনেছিল। সুবা বাংলার শ্রেষ্ঠ ওঝা। সে-ও আমাকে তাড়াতে পারেনি। কিন্তু আপনি আমাকে হার মানিয়েছেন। এবারে অনুমতি করুন, আমি বাড়ী ছেড়ে পালাই।

তারপর একটু থামিয়া বলিল—নাঃ, বাড়ীটা বেশ ছিল। একদিকে বেল গাছ, একদিকে তাল গাছ, হাওয়া খাবার কি সুবিধেই না ছিল।

আবার একটু থামিয়া বলিল—ধন্য আপনার শিক্ষা। এই সব মন্তর আবার যখন ছাপা হয়েছে, বাংলা দেশে আর আমাদের বাস করা চল্‌ল না দেখছি। বাঙালী ভূত বাংলার বাইরে গেলে কি আর জায়গা মিলবে? ছাতু ভূত, মেড়ো ভূত, বেহারী ভূত, পাঞ্জাবী ভূত—সবাই বলবে, "বাঙ্গালী ভূঁত বংলামে যাও।" তা তাদের তাড়া খাই, সেও ভাল, না হয় পাগড়ী প'রে বাঙালীকে গাল দিয়ে রাষ্ট্রভাষা শিখে নিয়ে জাত ভাঁড়াবো, কিন্তু আপনার মন্তর অসহ্য।

এই বলিয়া সে গলায় গামছা দিয়া রাম-দার পায়ের কাছে একটা প্রণাম করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটা কাঁপিয়া উঠিল।

অনেক চেষ্টার পরে রমেশ ও যতীনের মূর্চ্ছা ভাঙিল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা বাসায় ফিরিয়া আসিল।

ঘটনা নানালোকে নানাভাবে বলিতে লাগিল। কেহ বলিল—রাম-দা লড়াই করিয়া ব্রহ্মদৈত্য তাড়াইয়াছেন, কেহ বলিল—সর্ষে পড়া দিয়া; আবার কেহ বলিল—মন্তর পড়িয়া। আসল রহস্য কেহই জানিল না, তবে সকলেই দেখিল যে বাড়ীটাতে আর কোন উৎপাত নাই।

রাম-দা এখন নামজাদা ভূতের ওঝা, তিনি ভিজিট লইয়া ভূত তাড়ান; মানুষকে ভূতে পাইলে ভূত ছাড়ান, খানদুই বাড়ীও কলিকাতায় করিয়াছেন। রাম-দা'র কবিতাপাঠ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতরূপে সার্থক হইয়াছে। তাঁর ঠিকানা চাই? ঠিকানা দেওয়া বাহুল্যমাত্র—তাঁর পরিচয় আজ কে না জানে?

কাঙালী-ভোজন

সেদিন একখানা বইয়ে একটি গল্প পড়িলাম।

এক রাজার একবার বড় ইচ্ছা হইল যে তিনি নরমাংস ভোজন করিবেন। তিনি প্রধান পাচককে ডাকিয়া সেইরূপ আদেশ করিলেন। রাজার প্রধান মন্ত্রী পাচককে বলিলেন যে তুমি নরমাংস রন্ধন করো, কিন্তু আমাকে না জানাইয়া তাহা রাজাকে দিও না।

নরমাংস পাক হইলে প্রধান মন্ত্রী চাখিবার জন্য এক খণ্ড মাংস মুখে দিলেন। তিনি দেখিলেন যে তাহা অমৃতের মত সুস্বাদু। অমনি তিনি প্রচুর পরিমাণে লবন তাহাতে ঢালিয়া দিয়া পাচককে বলিলেন—এইবারে রাজাকে খাইতে দাও।

রাজা ওই অতিলবণাক্ত মাংস মুখে দিয়া বিরক্ত হইলেন এবং পাচককে মাংস সরাইয়া লইয়া যাইতে বলিলেন।

প্রধান মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শুধাইলেন—মহারাজ, মাংস কেমন লাগিল?

রাজা বলিলেন—মাংস অত্যন্ত লবণাক্ত।

মন্ত্রী বলিলেন—এইরূপ যে হইবে তাহা আমি জানিতাম! অন্যান্য পশুপক্ষী লবণ খায় না, সে সব মাংসে লবণ দিতে হয়, মানুষ খাদ্যে লবণ খায়, কাজেই স্বভাবতঃই তাহার মাংস অত্যন্ত লবণাক্ত হইবে।

রাজা বলিলেন—তাহা হইলে আমার নরমাংস ভোজন আর হইল না।

মন্ত্রী মনে মনে স্বস্তি অনুভব করিল।

পরে এক সময়ে পাচক মন্ত্রীকে মাংসে লবণ দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

মন্ত্রী বলিলেন—লবণ দিয়া নরমাংস বিস্বাদ না করিয়া দিলে, মহারাজ যদি বুঝিতেন যে নরমাংস সত্যই সুস্বাদু, তবে কি আর রাজ্যে মানুষ থাকিত। আবার রাজ্যে মানুষ ফুরাইলে তিনি পররাজ্য আক্রমণ করিতেন। পৃথিবীর অন্যান্য রাজা মহারাজারাও নরমাংসের গুণ বুঝিতে পারিত, এবং কালক্রমে পৃথিবীর রাজা মহারাজারা মিলিয়া পৃথিবীর সব মানুষ খাইয়া ফেলিয়া পৃথিবী মানুষ-শূন্য করিয়া তুলিত। কাজেই মহারাজাকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য—আমি এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

গল্পটি এই।

ইহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে নরমাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। আর মিথ্যা মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? রাজা মহারাজাদের যে নরমাংসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে, তাহা কে না জানে?

এখন, নরমাংস সুস্বাদু বলিয়া পড়িবার পর হইতে আমার মনে একটি মহৎ আইডিয়া উদিত হইয়াছে।

কিছুদিন হইল কলিকাতা সহরে ভিক্ষুক-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। সত্য বলিতে কি ভিক্ষুক সমস্যা কলিকাতার নাগরিক জীবনের একটি প্রধান বিঘ্ন। ভিক্ষুকরা গৃহস্থের বাড়ীতে না শুইয়া ফুটপাথে রাত্রি কাটায়। কাণ্ডজ্ঞানের একান্ত অভাব! তুমি যখন সুশোভন হোটেলে বসিয়া দামী খানা খাইতেছ তখন পথের ওপারে তাহার ক্ষুধিত মুখ দেখা দিয়া তোমার রসভঙ্গ করে।

তুমি যখন মোটরে বান্ধবী (অনেক সময়েই পরস্ত্রী) লইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছ তখন সে কোথা হইতে অকস্মাৎ মোটরের মধ্যে তাহার বীভৎস হাত বাড়াইয়া দিয়া ভিক্ষা চায়। কি আস্পর্দ্ধা! এমন কি মাঝে মাঝে তোমার মোটর চাপা পড়িয়া গিয়া তোমার মোটর (যার মূল্য এখনো শোধ হয় নাই) জখম করিয়া দেয়।

এ হেন ভিক্ষুক-উপদ্রব দূর না করিলেই নয়, এ বিষয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে অভিন্নমত।

একবার শুনিয়াছিলাম যে তাহাদের জন্য নগরোপকণ্ঠে এক প্রাসাদ তৈয়ারি হইবে—আজিও সে প্রাসাদ আকাশ-প্রাসাদ রহিয়া গিয়াছে। আর তৈরি হইলেই বা কি? তাহাতে কি ফুটপাথচারী ভিক্ষুকেরা স্থান পাইবে? মন্ত্রী, কাউন্সিলার, এম, এল, এ, মহাশয়দের সুপারিশ তাহারা কোথায় পাইবে?

অতএব ওসব উপায়ে ভিক্ষুক-সমস্যার নিরাকরণ হইবে না। এক্ষণে আমি একটা উপায় বলিতেছি—ইহাতে নিশ্চিত এই সমস্যার সমাধান হইবে।

কলিকাতায় ছোট বড়, ভালমন্দ অসংখ্য রেষ্টুরেণ্ট আছে—তাহাতে প্রতিদিন হাজার হাজার চপ, কাটলেট ও প্রচুর পরিমাণ মাংস বিক্রয় হয়। এখন, এই ভিক্ষুকদের ধরিয়া তাহাদের মাংসে চপ, কাটলেট, কোপ্তা, কোর্ম্মা রাঁধিয়া বিক্রয় করিলে শুধু যে এই সমস্যার সমাধান হইবে তাহা নয়—এক ঢিলে এক ঝাঁক পাখা মরিবে। কত সুবিধা দেখুন।

প্রথমতঃ, ভিক্ষুক সমস্যার সমাধান হইয়া মোটরের পথ নির্বিঘ্ন হইবে—সহরে মোটর একসিডেন্ট কমিবে।

দ্বিতীয়তঃ, পাঁঠা বলিয়া যেসব কুকুরের মাংস রেষ্টুরেণ্টে চালানো হয় সে সব কুকুর প্রাণে বাঁচিয়া যাইবে।

সদ্‌গুণের বিচারে মানুষের চেয়ে কুকুর অনেক শ্রেষ্ঠ তাহাতে নিশ্চয়ই কাহারো সন্দেহ নাই। আমার এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু বলেন যে Evolution এর বিচারে মানুষের অনেক ধাপ উচ্চে কুকুর। যে-সব জন্তুকে এখন আমরা কুকুর বলি, এক সময়ে তাহারা মানুষ ছিল, এবং এখন যাহারা মানুষ কয়েক লক্ষ বৎসর পরে তাহারা কুকুর হইবে। কুকুর যে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, এত প্রাণী থাকিতে স্বয়ং

ধর্ম্ম কুকুরের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাভারতের কাহিনীতে ইহাই প্রমাণ হইতেছে। প্রভুভক্তি, কৃতজ্ঞতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, প্রাণশক্তি, স্বজাতি-বিদ্বেষ প্রভৃতি গুণে কুকুর মানুষের অনুকরণস্থল।

কাজেই এই উপলক্ষ্যে এতগুলি কুকুর বাঁচিয়া গেলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হইবে।

তবে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভিক্ষুকদের বধ করিলে মানুষমারার আইনে দণ্ড হইতে পারে।

ইহা প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে করি না। আমার নিজের অভিমত, ভিক্ষুকেরা মানুষ নয়। মানুষের মত তাদের আকৃতি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও বলিব যে মানুষের মত আকৃতি হইলেই মানুষ হয় না। যাহারা ফুটপাথে ঘুমায়, রুগ্ন, দরিদ্র, নিরন্ন, নির্ব্বাস তাহাদেব মানুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া আমি মনুষ্যজাতিকে অপমান করিতে পারি না।

তবে নিতান্ত যুগধর্ম্মের খাতিরে যদি তাহাদের মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়, তাহাতেই বা ভয় কিসের ?

কাউন্সিল আছে, তাহাতে একটা আইন পাশ করিয়া নিলেই চলিবে। সেখানে যদি কেহ বিপরীত তর্ক তোলে ? সে ভয় নাই। হাতের জোরে সেখানে সত্যনির্দ্ধারণ হয়, হাতের তো আর মাথা নাই। আর ইহার চেয়েও অনেক অসম্ভব আইন সেখানে পাশ হইয়াছে, কাজেই আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন—ইহাও পাশ হইয়া যাইবে যে ভিক্ষুকেরা মানুষ নয়, তাহাদের বধ করিলে কোন দণ্ড হইবে না।

বিশেষ, নিত্য অভাবগ্রস্ত গভর্ণমেণ্টের ইহাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। ভিক্ষুকদের স্বত্বস্বামিত্ব গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া সম্পত্তি ইহা গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিতে পারেন। রেষ্টুরেন্টের মালিকরা গভর্ণমেণ্টকে প্রত্যেক ভিক্ষুক কিছু কিছু দিয়া কিনিয়া লইবে ; তাহাতেও খুব বেশি

দাম লাগিবে না। পাঁঠা ওরকে কুকুরের মাংসের সের যদি দশ আনা হয়, তাহা হইলে ভিক্ষুকের মাংসের সের পাঁচ আনা ফেলা যাইতে পারে। তবে এসব detail স্থির করিবার জন্ম গভর্ণমেণ্ট একটা কমিটি বসাইতে পারেন।

আবার দেখুন, ভিক্ষুকদের ইহাতে কত সুবিধা। তাহাদের ভিক্ষা করিতে হইবে না, ফুটপাথে ঘুমাইতে হইবে না, মোটরচাপা পড়িতে হইবে না, এমন কি চপীভূত হইবার জন্ম ঘাতকের আঘাতও সহ্য করিতে হইবে না। অস্ত্রাঘাতে বধ করিলে রক্ত পড়িয়া নষ্ট হইবে, ভিক্ষুকের গায়ে আর কতটুকুই বা রক্ত! রক্তপাত না করিয়া তীব্র ইলেকট্রিক শকে' তাহাদের মারিলেই চলিবে। চপ, কাটলেট বনিয়া গিয়া ধনীর ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করার চেয়ে ভিক্ষুকরা আর কি সৌভাগ্য কল্পনা করিতে পারে?

আবার এই ভিক্ষুকদের monopoly হইতে গভর্ণমেণ্টের যে লাভ হইবে তাহা দিয়া আরও জন দশেক মন্ত্রীর বেতন হইতে পারে। কাউন্সিলে আড়াইশ সভ্য, আর মন্ত্রীমাত্র দশজন, ইহাতেই কাউন্সিলে যত কিছু দ্বেষপ্রেমের গণ্ডগোল। যে দিন পাঁচশো সভ্য পাঁচশো মন্ত্রীতে পরিণত হইবেন—সে দিন আর 'দ্বেষের' কাজ লইয়া বিবাদ থাকিবে না।

এখন একটা তর্ক উঠিতে পারে যে এমন ভাবে চলিলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই দেশের সব ভিক্ষুক নিঃশেষ হইয়া যাইবে—তখন কারা বা ধনীদের জন্ম চপ হইবে আর কারা বা অতিরিক্ত মন্ত্রীদের বেতন জোগাইবে?

ইহাতে ভয় পাইবার কিছু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। দেশের যে-আইন এবং পৃথিবীর যে-আবহাওয়া তাহাতে ভিক্ষুক শ্রেণী কখনো লোপ পাইবে বলিয়া বোধ হয় না—বরঞ্চ উত্তরোত্তর ভিক্ষুকশ্রেণীর বাড়িবারই সম্ভাবনা।

এখন স্বাস্থ্যের দিক্ হইতে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। সকল ভিক্ষুকই কিছু নীরোগ নয়; রোগগ্রস্ত ভিক্ষুকদের মাংস ধনীদের পাতে দেওয়া চলে কিনা? ইহাতে কি ধনীদের বাঁচিবার মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইবে না?

এ প্রশ্ন সমীচীন বটে। তবে ইহারও সমাধান আছে। ভিক্ষুকদের monopoly লব্ধ টাকা হইতে একটি হাসপাতাল খোলা যাইতে পারে। রোগগ্রস্ত ভিক্ষুকদের সেখানে রাখিয়া চিকিৎসা করিয়া নীরোগ হইলে তখন তাহাদিগকে বিক্রয় করা চলিবে—বরঞ্চ হাসপাতাল-ফেরৎ ভিক্ষুকদের চাহিদা বেশী হইবে, চাহিদা অনুসারে দাম, কাজেই তাহারা উচ্চতর মূল্যে বিক্রীত হইবে। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই—ফাঁসির আসামীকেও বহুব্যয়ে আরোগ্য, সুস্থ, সবল করিয়া তুলিয়া তবে ফাঁসি দেওয়া হয়—কারণ একটা রুগ্ন মানুষকে ঝুলাইলে মানুষের হনন-বিজ্ঞান তৃপ্তিলাভ করে না।

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে আমি এই সমস্যার সামাজিক, স্বাস্থ্যিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক দিয়া আলোচনা করিলাম—এক্ষণে আশাকরি এ বিষয়ে দেশের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা বিস্তার লাভ করিবে।

পাঠক, তুমি যদি ধনী হও—ইহাতে তোমার লাভ; আর যদি দুর্ভাগ্য-বশতঃ তুমি ভিক্ষুকশ্রেণীভুক্ত হও, তবু তোমার ক্ষতি নাই; হয় তুমি চপ খাইবে, নতুবা চপীভূত হইবে।

বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, অঙ্গীকারভঙ্গ, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাকথন-কৌশল, প্রতিপত্তি, রূপ, তহবিল-ভঞ্জন প্রভৃতি যে সব গুণ থাকিলে 'পপুলার ইলেক্‌শনে' যাওয়া যায়, তার সবগুলি আমার নাই—তবে আশা করিতেছি শীঘ্রই সে সব আয়ত্ত করিয়া আইন পরিষদে যাইতে পারিব। কিন্তু যতদিন আমি এম, এল, এ, না হইতে পারিতেছি আমার হইয়া কোন সদাশয় মেম্বার কি পরিষদে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিবেন?

তিনি সকল দলের অনুমোদন যে লাভ করিবেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইলে, আমরা তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসীরা কঠিন প্রস্তরে তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া গোলদীঘিতে স্থাপন করিয়া দিব—এখনও সেখানে কিঞ্চিৎ স্থান অবশিষ্ট আছে।

পুনশ্চ:

সুইফ ট নাকি ঠাট্টা করিয়া এই জাতীয় একটা প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সুইফ্‌টের সঙ্গে আমার প্রভেদ এই যে এই প্রস্তাব ঠাট্টাবিদ্রূপ নয়—নিতান্ত আন্তরিক!

মধুসূদন-ভারতচন্দ্র সংবাদ

মধুসূদন। আঃ কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে—মৃত্যুর পরও শান্তি পাব না?

এক ব্যক্তি। কেন কি হয়েছে?

মধুসূদন। তুমিও বাঙালী দেখছি। আমার মৃত্যুশয্যার শিয়রে বাঙালী কবিরা কলম উঁচিয়ে বসে ছিল, যেমনি নাভিশ্বাস উঠেছে, অমনি কবিতার বান বইয়ে দিলে। আরে ভাল করে মরতেই দে!

এক ব্যক্তি। কেন?

মধুসূদন। দু'চারটে লাইন কানে ঢুকেছিল।

এক ব্যক্তি। তা'তে ক্ষতি কি?

মধুসূদন। ক্ষতি কি! ওই শব্দগুলো এক ঝাঁক মৌমাছির মত তাড়া করে আসছে। মৃত্যুর বিস্মৃতিতেও ওদের আটকাতে পারেনি। কি কুক্ষণেই লিখেছিলাম "কুচের মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" মধুচক্রে মধুর সন্ধান পেলাম না, মৌমাছির হুলের দংশনে কাণ দুটো গেল।

এক ব্যক্তি। একেই বলে অদৃষ্টের হরিহাস।

মধুসূদন। পরিহাস বলে' পরিহাস। একেবারে কাণ ধরে পরিহাস। আচ্ছা তুমিও তো বাঙালী, এমন কবিতা জান যাতে কাণ জুড়িয়ে যায়।

এক ব্যক্তি। জানি বই কি!

মধুসূদন। আবৃত্তি কর—কাণ জুড়োক।

এক ব্যক্তি। পছন্দ হবে কি! আচ্ছা তবে শোন

"অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী
ত্বরায় আনিলা নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীকে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার
ভয় করি কিবা জানি কে দেবে ফেরফার॥"

মধুসূদন। আঃ এতক্ষণে কাণ জুড়লো। থেম না, থেম না, আবৃত্তি করে' যাও—

এক ব্যক্তি। "বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হ'য়ে
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী বলেন।তোর নায়ে ভরা জল
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুইব বল।
পাটনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥"

মধুসূদন। এ যেন শোনা কবিতা! কিন্তু তাহোক, তুমি বলে যাও।

এক ব্যক্তি। "প'টনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতি-উপরে
তার ইচ্ছা নাহি হলে কি তপ সঞ্চারে॥
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥"

মধুসূদন। গ্র্যাণ্ড! শুধু সেঁউতি কেন আমার হাতে পড়লে সমস্ত নৌকাখানাই সোনা করে দিতাম, সেই হত আমার সোনার তরী; পরবর্ত্তী কোন কবির জন্য এ কাজ আর বাকি রাখতাম না! চমৎকার—এতক্ষণে কাণের গ্লানি গেল।

এক ব্যক্তি। কিন্তু মধুসূদন, বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে যে লোকটাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ঈর্ষ্যা করতে এ যে তারই কবিতা।

মধুসূদন। কৃষ্ণনগরের সেই লোকটা?

এক ব্যক্তি। এতই অবজ্ঞা যে তার নামও করতে নেই!

মধুসূদন। ভারতচন্দ্র!

এক ব্যক্তি। যাক, তবু তোমার মুখে রামনাম শোনা গেল!

মধুসূদন। বড্ড পরিহাস করে নিলে।

এক ব্যক্তি। কিন্তু আমার পরিহাস বোধ হয় অদৃষ্টের পরিহাসের মত মর্ম্মস্পর্শ করে নি।

মধুসূদন। নিশ্চয় নয়। আজ একবার ভারতচন্দ্রকে সম্মুখে পেলে খুব করমর্দ্দন করে নিতাম।

এক ব্যক্তি। এই তো হাত বাড়িয়ে দিয়েছি—কর না।

মধুসূদন। তুমি! বাই জোভ!

[প্রবল ভাবে করমর্দ্দন]

ভারতচন্দ্র। আঃ হাতখানা গেল যে।

মধুসূদন। যাক্! আমার যে কাণ যেতে বসেছিল।

ভারতচন্দ্র। আমি বাঁচিয়ে দিলাম—আর এই কি তার প্রতিদান।

মধুসূদন। ঠিক। ও বিদেশী কায়দায় আর নয়; এই নাও নমস্কার।

ভারতচন্দ্র। নমস্কার। মধুসূদন তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। যে-পয়ার পায়ের বেড়ি তুমি বঙ্গভাষায় পা থেকে খসিয়েছ বলে গৌরব বোধ করতে, সেই পয়ার আজ তোমার এত মিষ্টি লাগল কেন?

মধুসূদন। কথাটা আগে ভাবিনি—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কি জান, নূপুর আর বেড়ি তৈরি করবার ধাতু একই, ভঙ্গী আলাদা। বহুদিনের অভ্যাসে যাদের হাত বেহাত হয়েছে তারা নূপুর গড়তে গিয়ে বেড়ি তৈরি করে বসে।

ভারতচন্দ্র। যদি তাই হয় তবে দোষ হাতের, নূপুরের নয়।

মধুসূদন। আর যাদের কাণ ধ্বনির সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ধরতে পারে না, তারা বেড়ির শব্দে আর নূপুরের শব্দে ভুল করে বসে।

ভারতচন্দ্র। সে দোষ কাণের, নূপুরের নয়।

মধুসূদন। ও রকম সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সম্ভাবনা কোথায়? ভুলটা ভুলই, দোষ যারই হোক।

ভারতচন্দ্র। কিন্তু অকবিদের স্থূল হস্তাবলেপে পয়ার যদি গোময়লিপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে কবিদের উচিত তাকে ধুয়ে নির্ম্মল করে প্রকাশ করা, অবিচারে ত্যাগ করা নয়।

মধুসূদন। হয় তো তোমার কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু যুগধর্ম্ম বাম।

ভারতচন্দ্র। যুগধর্ম্ম কাকে বলছ?

মধুসূদন। পয়ারের যুগ চলে গিয়েছে।

ভারতচন্দ্র। সাহিত্যিক পত্রিকার বর্ষফল-গণনা আমাদের সময়ে ছিল না, কাজেই আমি তাতে অভ্যস্ত নই, এখন "কেবা রাজা, কেবা মন্ত্রী" বলতো—

মধুসূদন। এখন শুক্র রাজা, বুধ মন্ত্রী।

ভারতচন্দ্র। অস্যার্থ—

মধুসূদন। শুক্র দৈত্যগুরু, পশ্চিমের অসুরদের এখন আমরা গুরুর গৌরব দিয়েছি, তাই শুক্র আমাদের আরাধ্য।

ভারতচন্দ্র। সেই দৈত্যগুরুর কন্যা দেবযানী এসেছেন ভারতের ব্রহ্মচারী কবির মনোহরণ করবার জন্য।

মধুসূদন। চমৎকার বলেছ। এক্স্যাক্‌টুলি।

ভারতচন্দ্র। ওই বিদেশী শব্দগুলো বাদ দিয়ে বল।

মধুসূদন। "অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল"—যে যুগের যে ধর্ম্ম।

ভারতচন্দ্র। আমার অস্ত্রেই আমাকে মেরেছ। কিন্তু বেচারা কচের অবস্থা স্মরণ করে দেখেছ।

মধুসূদন। দেখেছি বই কি। তোমাদের পৌরাণিক কচ ছিল—

ভারতচন্দ্র। হাঁ, হাঁ, আর বলতে হবে না, ইঙ্গিতেই বুঝে নিয়েছি।

মধুসূদন। পারবেই তো। "বুঝে লোক যে জানে সন্ধান।" এ যুগের কচ দেবযানীর প্রণয়কে উপেক্ষা করে স্বর্গের মরীচিকার দিকে ছুটে যাবে না; এ যুগের কচ দৈত্যগুরুর বিদ্যার সঙ্গে দৈত্যগুরুর কন্যাকেও গ্রহণ করবে। এই হচ্ছে আমাদের নূতন যুগের বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান। আঃ কথা বলতে বলতে তোমার কাব্যের সীমানায় এসে প্রবেশ করেছি।

ভারতচন্দ্র। সেজন্য বিরক্তি কেন?

মধুসূদন। বাংলা সাহিত্যে তোমাকেই একমাত্র আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে স্বীকার করতাম।

ভারতচন্দ্র। মধুসূদন, বাংলা সাহিত্যের আঙিনা যথেষ্ট উদার; তাতে তোমার আমার এবং আমাদের বড় আরও অনেকের স্থান হবে।

মধুসূদন। আমার চেয়েও বড়!

ভারতচন্দ্র। পৃথিবী বিপুল, কালও নিরবধি। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এই যে নবযুগের উল্লেখ করলে, ওতে কি সত্যিই বিশ্বাস কর?

মধুসূদন। নিশ্চয়!

ভারতচন্দ্র। নবযুগের জন্য এত অকালব্যগ্রতা কেন? পুরাতন যুগের কর্ত্তব্য কি শেষ করেছ?

মধুসূদন। সে ভাবনা আমার নয়। আমি নবসূর্য্যোদয়ের আলো-অন্ধকারের মধ্যে ছায়াশরীরী আসন্ন নবযুগকে লক্ষ্য করেছি।

ভারতচন্দ্র। সে ছায়াশরীরী সত্তা নবযুগ নয়; পুরাতন যুগের অতৃপ্ত প্রেতাত্মা বুভুক্ষু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

মধুসূদন। নাঃ, তুমি নেহাৎ রক্ষণশীল।

ভারতচন্দ্র। আমি বৈপ্লবিক রক্ষণশীল।

মধুসূদন। সে আবার কি?

ভারতচন্দ্র। আমি রক্ষণশীলতার দ্বারা বিপ্লব আনয়ন করবো।

মধুসূদন। তার উপায় কি?

ভারতচন্দ্র। প্রথমে রক্ষণশীলতাকে রক্ষা করতে হবে।

মধুসূদন। সেটা কি করে হবে?

ভারতচন্দ্র। পয়ার ছন্দ দিয়ে।

মধুসূদন। একটু বুঝিয়ে বল।

ভারতচন্দ্র। কথায় কথায় সেখানে ঠিক সময়ে গিয়ে পৌছবো।

তার আগে তোমার বর্ষফলের বুধের মন্ত্রিত্বের গুণ সম্বন্ধে কিছু বল দেখি।

মধুসূদন। বুধের বৃত্তি হচ্ছে ব্যবসায়, মনে মনে সে বৈশ্য। আমাদের সাহিত্য হচ্ছে ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যের যুগ্মবাহুর কীর্ত্তি।

ভারতচন্দ্র। অর্থাৎ তার এক হাতে রচ্ছে অস্ত্র, আর এক হাতে টাকার থলি।

মধুসূদন। এবং সে থলিতে চল্লিশ হাজার টাকা। আমি বেশ চিন্তা করে দেখেছি বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকার কমে কোন সাহিত্যিকের জীবনযাপন সম্ভব নয়। তোমাকে কৃষ্ণচন্দ্র কত টাকার আয়ের সম্পত্তি দিয়েছিল!

ভারতচন্দ্র। আমি তো সাহিত্যিক ছিলাম না।

মধুসূদন। সাহিত্যিক ছিলে না?

ভারতচন্দ্র। হয়তো পরোক্ষভাবে ছিলাম। কিন্তু আমাদের সময়ে জীবনের আদর্শ ছিল ভদ্রতা, আমি ভদ্রলোক ছিলাম, সেই ছিল আমার সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয়।

মধুসূদন। তোমাদের সময়ে তবে কি সাহিত্যিক ছিল না?

ভারতচন্দ্র। সাহিত্যিক আর ভদ্রলোক বলে দুটো স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল না, কোন কোন ভদ্রলোক কবিতা রচনা করত, এইমাত্র। তোমাদের সময়ে বোধহয় কোন কোন সাহিত্যিক ভদ্রতা রক্ষা করে চলে, কি বল? এইভাবে সময়ের হাওয়া উল্টে যাওয়াকেই তো তোমরা নবযুগ বলে থাক।

মধুসূদন। নবযুগ নিয়ে পরিহাস করো না। ও তুমি বুঝতে পারবে না।

ভারতচন্দ্র। চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?

মধুসূদন। আমি অমিত্রাক্ষরের খাল কেটে ইউরোপের নবীন রক্তকে বাংলার ধমনীতে প্রবাহিত করে দিয়েছি!

ভারতচন্দ্র। অর্থাৎ খাল কেটে কুমীর ঢুকিয়েছ।

মধুসূদন। নাঃ তুমি কিছুতেই বুঝবে না দেখছি। "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

ভারতচন্দ্র। আমাকে তুমি অবজ্ঞা করতে, কিন্তু আমার কাব্য তো ভাল করেই পড়েছ দেখছি।

মধুসূদন। আচ্ছা, এই নাও, আমি স্থির হয়ে বসলাম, পয়ার সম্বন্ধে তোমার কি বক্তব্য আছে, বল।

ভারতচন্দ্র। তার আগে একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। আমি জন্মেছিলাম ইতিহাসের এক পর্ব্বান্তে, আর তোমার জন্ম আর এক পর্ব্বারম্ভে।

মধুসূদন। হিয়ার। হিয়ার। "একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে।" ভারতচন্দ্র এই পর্ব্বভেদকেই আমরা যুগভেদ বলে থাকি।

ভারতচন্দ্র! কিন্তু ভেদটা দেখলে কোথায়? পরিবর্ত্তন তো নিয়তই হচ্ছে, পরিবর্ত্তন তো নবায়ন নয়। ওকি ওরকম মুখ করলে কেন?

মধুসূদন। বুঝতেই পারছ, কথাগুলো খুব হৃদ্য নয়।

ভারতচন্দ্র। ঠিক, এ-যে "রুগী যেন নিম গেলে মুদিয়া নয়ন।" এখন, এই যুগভেদে ছন্দের ধর্ম্মভেদ হয়েছে। পয়ার এই পর্ব্বান্তের ছন্দ। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ান্তে যবনিকা পড়েছে, দর্শকদের বিদায়ের জন্য কাংস্যঘণ্টা বাজছে, পয়ারের অন্ত্যানুপ্রাসে তারই প্রতিধ্বনি! আমাদের ছায়া-ঘেরা পল্লী, ঘুমে-ঘেরা রাত্রি, বেড়া-ঘেরা অন্তঃপুর, আর নিয়মেঘেরা জীবনযাত্রা, এর বাণীকে বহন করবার যোগ্যতা আছে পয়ারের। পয়ার হচ্ছে ছন্দের দলে পদাতিক; পদচারের দ্বারা পায়ে পায়ে পথ অতিক্রম করছে, অশ্বারোহীর উন্মাদনার ঝাঁপতালকে সে বহন করতে অক্ষম। আমার ছন্দ আমার যুগের মাপে তৈরী।

জমিদার বাদশাহী নাগরায় কি লাভ, যদি তা আমার পায়ের মাপে না হয়?

বাংলাকাব্যের প্রথম উন্মেষের ক্ষণ থেকে এই ছন্দটিকে পূর্ণায়ত করতে পারেনি। বৈষ্ণব কবিরা ছিলেন মহাজন, তাঁদের প্রতিভা ছিল গরুড়ের মত আকাশমুখী, কিন্তু তাঁদের যুগ পয়ারের যুগ ছিল না। গৌরাঙ্গের পদধ্বনি অনুক্ষণ তাঁরা হৃৎপিণ্ডের তালে তালে শুনতে পাচ্ছিলেন, তারই সঙ্গে পা মিলিয়ে তাঁরা নাচতে নাচতে চলেছিলেন। তাঁদের বিহ্বল পদচিহ্নের পদাবলীর ছন্দকে আমি বলি নৃত্যচারী বা নাচাড়ী। তারপরে আবার অনেক কাল গিয়েছে, গৌরাঙ্গের পদধ্বনি মিলিয়ে গিয়েছে, বাঙালী কবির আকাশমুখী প্রতিভা ক্লান্ত হয়ে পাখা গুটিয়ে মাটিতে এসে বসেছে, নিত্যকালের সুধার প্রার্থনায় আকাশের দিকে চাইতে ভুলে গিয়ে প্রত্যহের ক্ষুৎ-তণ্ডুলের আশায় মাটির দিকে তাকাতে আরম্ভ করেছে, সংসারের সুখদুঃখের মধ্যে আশা-উৎসাহের উঞ্ছকণা খুঁটে পায়ে পায়ে সে চলতে শিখেছে, বাঙালীর সেই মানসিক পদচারের পদাঙ্ক হচ্ছে পয়ার ছন্দ। একে অবহেলা করতে পার কিন্তু অবজ্ঞা ক'র না, পয়ার হচ্ছে একটা যুগের বাঙালীর মনের ছাঁচ। এ ছাঁচ তোমাদের প্রয়োজনে আর যদি না লাগে, একে রক্ষা করো, উপেক্ষা করে' ভেঙে ফেল না।

মধুসূদন। আমার অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঁধ-ভাঙা যুগের ছন্দ, এর ভাঙাবাঁধের যতিস্থাপনের স্বাধীনতার ফাঁক দিয়ে ইউরোপের প্রাণ-প্রবাহ বাংলা সাহিত্যে এসে প্রবেশ করেছে, এবং ক্রমে তা বাস্তবে গিয়ে প্রবেশ করবে।

ভারতচন্দ্র। ওই তোমাদের আর একটা মস্ত ভুল। বাস্তব আর সাহিত্যকে তোমরা মিশিয়ে ফেলে মিছামিছি একটা গোল পাকিয়ে তুলেছ।

মধুসূদন। ইউরোপে এমন হ'য়ে থাকে।

ভারতচন্দ্র। ইউরোপ অধঃপাতে যাক্।

মধুসূদন। এত উষ্মা কেন?

ভারতচন্দ্র। সাহিত্য আর বাস্তব সমান্তরাল নদীতটের মত চলেছে—তার মাঝখানে নিরন্তর তরঙ্গিত হচ্ছে জীবনলীলা। এই জীবন-লীলাকে রক্ষা করবার জন্যই সাহিত্যের, শিল্পের সার্থকতা। আর যেখানে সাহিত্য ও বাস্তবের দুই তটরেখা মিশে গিয়েছে, সেখানে নদী তো লুপ্ত। তোমাদের কাছে জীবনের চেয়ে সাহিত্য বড় হয়ে উঠেছে, সেইজন্যই সাহিত্যের সার্থকতাও আর নাই; সাহিত্য তোমাদের মুখের কথায় মাত্র পর্য্যবসিত।

আমরা জানতাম, সাহিত্য আর জীবন স্বতন্ত্র সত্তা—তাই সাহিত্যের গ্লানি জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি। আমার কাব্যে এমন অনেক অংশ আছে ইচ্ছা করলে যাকে অশ্লীল বলতে পার, কিন্তু তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি, তার কারণ আমাদের ধারণায় সাহিত্য হচ্ছে জীবনের ভৃত্য, ভৃত্যের কাঁধে মলিন গামছা হয়তো থাকে, কিন্তু তাকে উত্তরীয় বানাবার সখ মনিব কখনো করেনি।

মধুসূদন। আমার মেঘনাদবধ কাব্যে কি এই নিরপেক্ষতা দেখতে পাও নি?

ভারতচন্দ্র। মেঘনাদবধ কাব্যে নিরপেক্ষতার ভাণ আছে মাত্র;—নিরপেক্ষতা নাই। তোমার এই অমর কাব্যের ফ্রেমখানাকে পৌরাণিক যুগের স্বর্ণলঙ্কার সোনা দিয়ে বাঁধিয়েছ। কিন্তু যে ছবি এতে প্রতিবিম্বিত তা পৌরাণিক নয়—নিতান্ত আধুনিক।

মধুসূদন। আধুনিক?

ভারতচন্দ্র। আধুনিক বই কি! তোমার বিদ্রোহী, অনাচারী রাবণ ইংরাজি শিক্ষার প্রথম আমলের বিদ্রোহী, অনাচারী বাঙালী যুবকের

প্রতিবিম্ব! তোমরা সকলেই খুদে খুদে রাবণ হয়ে উঠেছিলে, আর সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূর্য্যরশ্মি তোমার প্রতিভার আতসী কাঁচের ভিতর দিয়ে সংহত হয়ে রাবণের অতিকায়িক দীপ্তি সৃষ্টি করেছে, স্বর্ণলঙ্কার লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আরও একটা সত্য কথা শুনবে? সমুদ্রের পরপারবর্ত্তী অনাচারী রাক্ষসদের ঐশ্বর্য্যময় যে দ্বীপ তোমাদের মনোহরণ করেছিল তা সিংহল দ্বীপ নয়—তা শ্বেতদ্বীপ—ইংলণ্ড।

মধুসূদন। এ সব কথা কখনও ভাবিনি।

ভারতচন্দ্র। তার কারণ এসব কথা তোমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। মধুসূদন, তোমার অপরিমিত প্রতিভা ছিল, তাই বঙ্গ-সাহিত্যের স্বর্ণকুম্ভের মুখ খুলে যে দৈত্যকে বের করে দিলে তার হাতে তোমাকে নিগৃহীত হতে হয় নি। কিন্তু তোমার পরে যারা আসবে, তাদের সবারই তোমার প্রতিভা না থাকতেও পারে। তোমার শক্তি পাবে না, ঠাট মাত্র পাবে, তাদের দুর্দ্দশা স্মরণ করে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠছি।

মধুসূদন। এই দৈত্যের হাতে তাদের প্রাণের আশঙ্কা আছে?

ভারতচন্দ্র। তাদের প্রাণ যায়—যাক্। বঙ্গসাহিত্যের স্বর্ণঘট না ভেঙ্গে যায়।

মধুসূদন। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আরও আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

ভারতচন্দ্র। চল—তা হলে আমার সঙ্গে।

মধুসূদন। সঙ্গে কিছু আছে? ধার দিতে পার?

ভারতচন্দ্র। মধুসূদন—তুমি ঠিক সেই রকমই আছ, কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি দেখছি।

মধুসূদন। আচ্ছা ঋণ চাইলে লোকে উপহাস করে কেন, বলতে পারো?

ভারতচন্দ্র। তোমার ফিরিয়ে দেবার অভ্যাস নেই বলে।

মধুসূদন। তাতে ক্ষতি কি? আবার শেষ পয়সাটা পর্য্যন্ত আমি ঋণ দিতে প্রস্তুত; কতবার দিয়েওছি। কিন্তু তা নিয়ে তো বিদ্রূপ করিনি; ফিরেও চাইনি, ভুলেই গিয়েছি।

ভারতচন্দ্র। তোমার কাছে ঋণ আর ধন একার্থক; যেমন একার্থক সাহিত্য আর জীবন। কল্পনা আর বাস্তবে মিশিয়ে ফেলেছ বলেই তুমি ধনে ঋণে প্রভেদ করতে পার না।

মধুসূদন। তাতে ক্ষতি কি?

ভারতচন্দ্র। তোমার কিছু ক্ষতি নেই। যে ঋণ দেয় তার ক্ষতি।

মধুসূদন। ধন আর ঋণ বিষয়ে স্বর্গ দেখছি ঠিক পৃথিবীরই মত।

ভারতচন্দ্র। এ কথা কে বললে?

মধুসূদন। তবে?

ভারতচন্দ্র। স্বর্গ হচ্ছে সেই স্থান যেখানে ঋণ চাইলেই পাওয়া যায় আর ফিরে দিতে হয় না।

মধুসূদন। চমৎকার!

ভারতচন্দ্র। পৃথিবী হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে ঋণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ফিরে দিতে হয়।

মধুসূদন। আর নরক?

ভারতচন্দ্র। আর নরক হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে মোটেই ঋণ পাওয়া যায় না।

মধুসূদন। সর্ব্বনাশ!

ভারতচন্দ্র। সর্ব্বনাশ কিসের? তুমি তো স্বর্গে এসেছ—চল।

"পরিস্থিতি"

আমি একধারে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ; সপ্তাহের ছয়দিন আমি সাংবাদিক, সপ্তমদিনে সেই আমিই সাহিত্যিক। ছয়দিন যারা আমাকে জার্নালিজ্‌ম্‌ করিতে দেখিয়াছে, সপ্তমদিনে তারা আমাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে না।

মাথার উপরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে, বাঁ হাতে রয়টারের সংবাদের কাগজের খণ্ড, ডান হাতে কলম, কোলের কাছে শাদা কাগজ, সম্মুখে চলন্তিকা অভিধান, আর আমি অবলীলাক্রমে অভিধান ও ব্যাকরণের ট্রেঞ্চ ও সিগ্‌ফ্রিড্‌ লাইন অতিক্রম করিয়া সাংবাদিকতার সর্ব্বধ্বংসী ট্যাঙ্ক চালাইয়া দিয়াছি। শুনিয়াছি ট্যাঙ্কভেদী কামান বাহির হইয়াছে, কিন্তু আমাদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে ভেদ করিতে পারে এমন কামান কোথায় আছে?

বেশ ছিলাম। হঠাৎ কাগজের সম্পাদকের মাথায় দুষ্টা সরস্বতী চাপিল, সোমবারের কাগজের সঙ্গে কয়েক পাতা সাহিত্যিক ক্রোড়পত্র জুড়িয়া দিতে হইবে। আমরা বলিলাম—সাহিত্যিক কই?

সম্পাদক সংস্কৃত ভাষায় বলিয়া উঠিলেন—'আত্মানং বিদ্ধি।' তারপরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—নিজেদের জান্‌তে শেখো! তোমরাই সাহিত্যিক! সাহিত্যিক কি গাছে ধরে!

এই আপ্তবাক্যের ফলে আমরা সাহিত্যিক হইয়া গেলাম—কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দর্ভ প্রভৃতি লিখিতে লাগিলাম, শেষে সত্য সত্যই আমাদের ধারণা হইয়া গেল, আমরা সাহিত্যিক, কারণ সোমবারের ক্রোড়পত্রের কাট্‌তি হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতে লাগিল। আমরা

জরাসন্ধের মত কেরানি ও লেখকের যুক্তসংস্করণ হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে কে রক্ষা করিতে পারে? বিপদে পড়িলাম।

২

একদিন সন্ধ্যা বেলায় কলম পিষিয়া যাইতেছি। পাঠক! সন্ধ্যা বেলাতেই আমাদের কাজের আরম্ভ। সংস্কৃতে আছে, কবি, প্রেমিক ও চোরেরা রাত্রিকাল পছন্দ করে, স্পষ্ট-বুঝা যাইতেছে সেকালে সংবাদপত্র ছিল না, থাকিলে ওই সঙ্গে সাংবাদিকের নামও পাইতাম।

এমন সময়ে সম্পাদকের ঘর হইতে আমার ডাক আসিল। গেলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি রাগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—মশায়, আপনি বাঙালী নন্।

আমি বলিলাম—আজ্ঞে বাঙালী বইকি। তবে কিছুদিন আসামে ছিলাম।

সম্পাদক বলিয়া উঠিলেন—ঠিক, আপনি আসামী।

আমি বলিলাম—আজ্ঞে, অল্পদিন ছিলাম, ডমিসাইলড্ হইনি।

তিনি বলিলেন—সে আসামী নয়, ক্রিমিনাল, যাকে বলে—রাগের আতিশয্যে আর কিছু তিনি বলিতে পারিলেন না। আমি বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলাম—কেন?

কেন? বাঙালী হ'লে আপনি এ-ভাবে বাংলার জাতীয় সম্পদ নষ্ট করতে পারতেন?

সম্পাদক ক্রমেই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

আচ্ছা বলুন তো সংবাদপত্রের একখানা পাতা লম্বায়, চওড়ায় কত ইঞ্চি ?

বলিতে পারিলাম না।

সম্পাদকের মুখ দিয়া অটোম্যাটিকালি বাহির হইয়া আসিল—ধিক্।

লজ্জায় অধোবদন হইলাম।

—একখানা পাতা আগাগোড়া টান ক'রে খুলে ফেললে হয় ৩৬"× ২২", এমন থাকে ৪ খানা পাতা, অর্থাৎ পৃষ্ঠা।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্রোধে ও আনুষঙ্গিক একটা কারণে লাল দুই চোখের দৃষ্টি আমার মুখের উপরে রাখিয়া বলিলেন—পাঠশালায় বর্গফলের আঁক কষেছিলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবে গুণ করুন ; কষে বলুন কত বর্গ ইঞ্চি জায়গা হ'ল।

—আজ্ঞে ৭৯২ বর্গ ইঞ্চি।

—বেশ !—সম্পাদক যেন একটু প্রসন্ন হইলেন। বোধহয় ইতিপূর্ব্বে কোন সাংবাদিকের নিকটে এতখানি বিদ্যার পরিচয় তিনি পান নাই। তারপরে বলিলেন—কালকার কাগজে মধ্যইউরোপ সম্বন্ধে ওই নিবন্ধটা তো আপনিই লিখেছেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তখন কাগজের সেই পাতাটা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন—আচ্ছা এখানে কেন লিখলেন—"মধ্যইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা ভয়াবহ।"

—আজ্ঞে, অবস্থা যে সত্যিই ভয়াবহ।

—আবার 'অবস্থা' !—আহত শার্দ্দুলের মত লাফাইয়া উঠিলেন।

—আজ্ঞে তবে কি লিখব ?

—কি লিখবেন ? অবস্থা নয়, পরিস্থিতি, পরিস্থিতি !

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম—সেটা কি ?

কিন্তু দেখিলাম আমার কথা শুনিয়া তাঁর বিস্ময় আরও বেশী হইয়াছে !

—পরিস্থিতি জানেন না, আর আপনি সংবাদিকতা করতে এসেছেন ?

—আজ্ঞে, একটা শব্দ না জানলে কি আসে যায় ?

তিনি বলিলেন কোন শব্দ না জানলে কিছু আসে যায় না, সে কথা মানি। কিন্তু পরিস্থিতি তো একটা শব্দ নয়, ও যে একটা ফিলজফি—সংবাদপত্রে। ফিলজফি।

আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না—একটা টুলের উপর বসিয়া পড়িলাম।

সম্পাদক আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ফিলজফির ভাষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন !

—তবে শুনুন ! এখনি তো বলবেন যে একদিনের কাগজে থাকে ৭৯২ বর্গ ইঞ্চি ! আপনি যদি 'পরিস্থিতি' না লিখে 'অবস্থা' লেখেন, তবে, প্রত্যেক 'অবস্থায়'য় একটা করে অক্ষর কম লিখতে হয়। তা'তে যে-জায়গা টা ফাঁক থাকলো, সেখানে অন্য অক্ষর বসাতে হ'লে আপনাকে বেশি চিন্তা ও পরিশ্রম করতে হবে !

আমি বলিলাম,—আজ্ঞে পরিস্থিতি শব্দটা আর ক'বার ব্যবহার করা চলে ! ও'তে আর এমন কি পরিশ্রম বাঁচে ?

ধিক্কারের সঙ্গে সম্পাদক বলিলেন—ওই তো ফিলজফি-টা ধরতে পারেন নি ! যেখানে চার অক্ষরের শব্দ পাবেন, সেখানে তিন অক্ষরের শব্দ বসাবেন না : যেখানে তিন অক্ষরের পাবেন, সেখানে দু'অক্ষরের বসাবেন না। ভেবে দেখুন এ'তে কত কম পরিশ্রমে ও চিন্তায় কত বেশি জায়গা জুড়ে ফেলা যায়। এবারে একবার হিসাব করুন, বাংলা দেশে কতগুলো সংবাদপত্র বের হয়, তা'তে কত বর্গ ইঞ্চি জায়গা থাকে ;

মাসে কত বর্গ ইঞ্চি হ'ল! এই ফিলজফি অনুসরণ করলে কত কম পরিশ্রমে কত বেশি কাজ হয়। এবং এর যোগফল ক'রে দেখুন, বাঙালীর কত অর্থ ঘরে থেকে যায়।—বুঝলেন।

বলিলাম—আজ্ঞে তাহ'লে 'বাঘ'এর বদলে 'শার্দ্দূল' লিখতে হবে?

সম্পাদক উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন—ঠিক, ঠিক ধরেছেন; হাজার হোন আপনি বাঙালী তো! তারপরে যেন নিজের মনেই বলিলেন—ম্যাক্সমুলর বলেছিলেন, ভারতীয়েরা জন্ম থেকেই দার্শনিক, আমি বলছি—প্রত্যেক বাঙালী জন্ম থেকেই সাংবাদিক!

আমি সম্পাদকের প্রসাদ পাইয়া টেবিলে ফিরিয়া গেলাম—ও তদ্দণ্ড হইতে 'অবস্থা'র বদলে 'পরিস্থিতি', 'বাঘ' এর বদলে 'শার্দ্দূল', 'দুর্ব্বলতা'র বদলে 'স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য', 'অগ্নি'র বদলে 'বৈশ্বানর' প্রভৃতির শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিলাম। সম্পাদক আমার উপরে ভারি খুশী।

৩

এখন একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—আমাদের কাগজের এক প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ ছিল—নাম 'ধুরন্ধর'—ইহাদের মধ্যে সনাতন জ্ঞাতি-বৈরী-ভাব ছিল। আর ইহাদের সম্পাদকের যদি তুলনা করা যায়—কে কম, কে বেশি স্বয়ং বিধাতা বলিতে পারেন না—যেন বিধাতাপুরুষের মানসিক যমজ সন্তান—দুই জনেরই ওজন পাকি আড়াই মন!

কোন্ কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে কি বাহির হইবে তাহা দেখিবার জন্য দেশশুদ্ধ লোক অপেক্ষা করিয়া থাকিত। 'ধুরন্ধরে' যদি আজ কৃষি সম্বন্ধে লিখিত হইল, অমনি আমাদের কাগজেও কৃষি সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইল—তাহার ছত্রে ছত্রে ধুরন্ধরের গবেষণাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইত!

'ধুরন্ধরে' রিলেটিভিটি সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইল—তার পরদিন আমাদের কাগজেও রিলেটিভিটির সম্পাদকীয় প্রবন্ধ! আমাদের সম্পাদকের বিস্তার পরিধি দেখিয়া আমরা বিস্মিত, গৌরবান্বিত, পুলকিত হইতাম।

কিন্তু একদিন বড় অঘটন ঘটিল। 'ধুরন্ধরে' মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইল—একেবারে সম্পাদকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। সম্প্রতি তিনি কোন্ রেল কলিশনে পড়িয়াছিলেন—তারই স্মৃতি। প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম—আজ আমাদের সম্পাদক কি করিবেন!

আমাদের মধ্যে একজনের রসিক বলিয়া খ্যাতি ছিল, সে বলিল—কোন ভয় নেই, সম্পাদকের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা আছে।

আমরা বলিলাম—কি রকম?

সে বলিল—একদল লোক আছেন যাঁরা মরবার আগে অনেক বার মরে থাকেন, আমাদের সম্পাদক সেই দলের।

আমরা কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। কিন্তু সকলেই ধরিয়া রাখিলাম সম্পাদক সহজে ছাড়িবেন না, একটা কিছু করিবেনই।

রাত্রি ন'টা বাজিয়া গেল—সম্পাদক আফিসে আসিলেন না; সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পাওয়া গেল না—আর দেরি হইলে সম্পাদকীয় স্তম্ভ শূন্য থাকিয়া যাইবে। সকলে আমাকে বলিল, তুমি একবার তাঁর বাড়ীতে যাও।

আমি সম্পাদকের বাসায় রওনা হইলাম। বাসায় পৌঁছিলাম। নীচের তলা অন্ধকার। দোতলায় উঠিলাম। সেখানেও অন্ধকার—কেবল একটা ঘরে যেন আলো জ্বলিতেছে। সেই দিকে চলিলাম। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল—ঠেলিতেই খুলিয়া গেল; খুলিতেই যে-দৃশ্য আমার

চোখে পরিল, তাহা দেখিয়া অত্যন্ত অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—ভয়াবহ পরিস্থিতি!

ঘরের কড়িকাঠে গলায় দড়ি দিয়া আড়াইমণি সম্পাদক ঝুলিতেছেন। বিদ্যুৎবেগে একটি সন্দেহ মগজের মধ্যে খেলিয়া গেল—ইহা নিশ্চয় 'ধুরন্ধর' সম্পাদকের কাজ। কারণ মেঝেতে দেখিলাম—কাগজ ও কলম পড়িয়া রহিয়াছে, কাগজের উপরে যেন একটি প্রবন্ধের নাম—'আমার মৃত্যু।' বুঝিলাম 'ধুরন্ধরে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উত্তর দিবার জন্য তিনি প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছিলেন—এমন সময়ে 'ধুরন্ধর' সম্পাদক আসিয়া এই নৃশংস কাণ্ড করিয়া গিয়াছে।

কিন্তু আর ভাবিবার সময় ছিল না—তিনি তখন অর্দ্ধস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শূন্যে পা ছুঁড়িতেছেন। আমার পকেটে কাঁচি ছিল (জার্নালিষ্ট ও সম্প্রদায়বিশেষের পকেটে কাঁচি সর্ব্বদাই থাকে)। আমি দ্রুতহস্তে দড়ি কাটিয়া দিলাম; পাকি আড়াই মণ সশব্দে মাটিতে বাধ্যতামূলক অবতরণ করিলেন। পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেলেন। মাথায় জল দিলাম, হাওয়া করিলাম—প্রায় একঘণ্টা পরে সম্পাদক জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া চোখ মেলিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন—কে?

আমি পরিচয় দিয়া বলিলাম—একি ভয়াবহ—

তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—পরিস্থিতি! তারপর উঠিয়া বসিয়া রাগিয়া বলিলেন—তুমি দড়ি কাট্‌লে কেন?

আমি বলিলাম—আমরা জার্নালিষ্ট বলে' কি মানুষ নই!

তিনি বলিলেন—তুমি মানুষ-ই, জার্নালিষ্ট নও।

—সে কি স্যার—আপনার প্রাণ বাঁচালাম।

তিনি বলিলেন—তুমি প্রাণই চেন, মান চেন না, এখন আমি 'ধুরন্ধরে'র প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে কি লিখ্‌বো?

তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন—জানো, আমি মৃত্যু সম্বন্ধে লিখবার জন্ম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছিলাম।

সম্পাদকীয় নিষ্ঠা দেখিয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

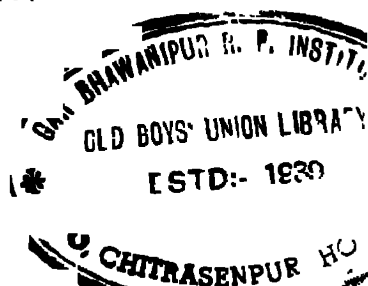
কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম—যে রকম অবস্থা আপনার হয়েছিল, আর দু' এক মিনিটের মধ্যে দড়ি না কাট্‌লে যে মরে যেতেন, তখন লিখ্‌তেন কি করে?

আমার যুক্তিতে তিনি থমকিয়া গেলেন। বুঝিলাম একথাটা আগে তাঁহার মনে হয় নাই, কিছুক্ষণ কোন কথাই তিনি বলিতে পারিলেন না, ইহার আগে কখনো তাঁহাকে হতবুদ্ধি হইতে দেখি নাই।

বিস্ময় দূর হইলে বলিলেন—সে একটা কথা বটে। কিন্তু তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না—তোমার মধ্যে এখনো মনুষ্যত্ব আছে, পূর্ণভাবে সাংবাদিকত্ব জাগে নাই। সত্যকারের সাংবাদিক কখনো আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আমার অভিজ্ঞতা নষ্ট করতো না। তোমার চাকরি গেল।

তাঁহার বিকার ও আমার বেকার দশা ভাবিয়া আবার অজ্ঞাতসারে, অত্যন্ত অনায়াসে আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—ভয়াবহ—

পাছে 'অবস্থা' বলিয়া ফেলি সম্পাদক দ্রুত পাদপূরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—পরিস্থিতি।



অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর

সুবৃহৎ উপন্যাস

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার—৩৷৷০

যুগান্তর বলেন—

উপন্যাসটির ভাষা স্বচ্ছ এবং সাবলীল, কোথাও কথার ঘূর্ণিপাকে অথবা অস্পষ্টতার শেওলায় আখ্যানভাগের গতিরোধ নাই। স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষার অপূর্ব্ব সমন্বয় কবিত্বের রস সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু ভাবালুতার কুজ্ঝটিকা আনে নাই, বাস্তব জগতের সজীবতা আছে, কিন্তু পাঁক ঘাঁটাঘাঁটির উৎসাহ নাই; দৃষ্টি ভঙ্গিতে নবীনের সরলতা আছে, কিন্তু উৎকট আধুনিকতা নাই; প্রেমের স্নিগ্ধ ছবি আছে কিন্তু তাহা "বালীগঞ্জ বিলাসী একজোড়া রুগ্ন যুবক-যুবতীর গল্প" নয়। * * * এমন একখানি উপন্যাস আমরা অনেকদিন পরে পড়িলাম।

আনন্দবাজার বলেন—

ইহা একটি প্রাচীন বংশের উত্থান ও পতনের কাহিনী। পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতে এই কাহিনীর গোড়া পত্তন ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইহার সমাপ্তি। কিন্তু ইহাকে কেবল ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে না। সে যুগের সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। সুবৃহৎ উপন্যাসের পাতায় পাতায় যুগের সুখ দুঃখ, অত্যাচার, উৎপীড়ন, সাহস ও দুঃসাহসের দৃশ্যগুলি একটার পর একটা আসিতেছে। গ্রন্থকার ইতিকথা বলিতে বসেন নাই। মানুষের হিংসা দ্বেষ ও ভালমন্দকে জীবন্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন,—এক বিগত যুগের সরল ও বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চে।

* * * মহাকাব্যের মত, এই কাহিনীতে বাংলার এক বিগত যুগের সমস্ত দিগের পূর্ণ পরিচয় ঘটে।

এই উপন্যাসখানি লিখিয়া প্রমথবাবু আমাদের কথা সাহিত্যে একটা নূতন পর্য্যায়ের সৃষ্টি করিলেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। এরূপ একখানা পুস্তক আমরা বহুদিন পড়ি নাই।

এই লেখকের—

কোপবতি—৩৷৷০ পরিহাস বিজল্পিতম্—১৷৷০